Born to Build SHAH CEMENT – সাপ্তাহিক ২000 গোলটেবিল

আবাসন শিল্পের সমস্যা ও সম্ভাবনা

গোলাম মোর্তোজা : আমাদের আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে আজকের এই গোলটেবিল বৈঠকে আসার জন্যে সবাইকে ধন্যবাদ। গোলটেবিল বৈঠক আয়োজনে সহায়তা করার জন্যে শাহ সিমেন্ট কর্তৃপক্ষকে অভিনন্দন। বাংলাদেশে বাস করতে গিয়ে আমাদের প্রতি পদে সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। সমস্যার যেন শেষ নেই। তবে এ কথাও সত্যি এই সমস্যা বা সংকটের পাশাপাশি প্রচুর সম্ভাবনাও আছে বিভিন্ন খাতে। আজকের এই আয়োজনে আমরা সম্ভাবনার কথাই বেশি শুনতে চাইবো। আবাসন মানুষের মৌলিক চাহিদার অন্যতম। গত কয়েক বছরে এই শিল্পের ব্যাপক বিকাশ ঘটেছে। কিন্তু বর্তমান সময়ে এসে আবাসন শিল্প সংকটের মধ্যে পড়ে গেছে। বিকশিত হচ্ছে না, যেভাবে হওয়ার কথা ছিল। এ কারণেই আমাদের আলোচনার বিষয় 'আবাসন শিল্পের সমস্যা ও সম্ভাবনা'। খুব কম কথা বলব। শুনবো আপনাদের কথা। সেখান থেকে আমরা একটি সিদ্ধান্ত পৌঁছাতে চেষ্টা করবো সমস্যা সমাধানের।

রিয়েল এস্টেড কোম্পানিগুলোর প্রতিনিধিত্বকারী প্রতিষ্ঠান রিহ্যাব। আলোচনা শুরু করা জন্যে অনুরোধ করবো রিহ্যাব সভাপতি ড. তৌফিক এম সেরাজকে। তার থেকে আমরা আবাসন শিল্পের বর্তমান সময়ের স্বচ্ছ চিত্র জানতে চাইবো।

ড. তৌফিক এম. সেরাজ : বেসরকারি আবাসন শিল্প তো বাংলাদেশে খুব বেশি দিন আগের না। মৌলিকভাবে গত ২০ বছর আগে এর সূত্রপাত। তার আগে খুব অল্প পরিসরে দু-একটা কোম্পানি ব্যবসা করেছে। গত ১০-১৫ বছরে এর ব্যাপক প্রসার ঘটেছে। এই মুহূর্তে ঢাকা শহরে প্রায় ৫ থেকে ৭ হাজার ইউনিট ডেলিভারি দেই বা দেয়ার ক্ষমতা রাখি। চট্টগ্রাম এবং সিলেটে অবশ্য এখন ব্যাপ্তি ঘটছে। গত

যাদের নিয়ে গোলটেবিল

ড. তৌফিক এম. সেরাজ, সভাপতি রিহ্যাব, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, শেলটেক

নাসরুল হামিদ, চেয়ারম্যান, হামিদ গ্রুপ

সালাউদ্দিন আহমেদ, নির্বাহী পরিচালক, সুবাস্তু ডেভেলপমেন্ট লিঃ

লুৎফুল্লাহ হুসাইন, ম্যানেজার, সেলস এন্ড মার্কেটিং, সুবাস্তু ডেভেলপমেন্ট লিঃ

আনসার উদ্দিন আহমেদ, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ন্যাশনাল হাউজিং ফিনান্স এন্ড ইনভেস্টেমেন্ট লিঃ

ড. শায়ের গফুর, সহযোগী অধ্যাপক, স্থাপত্য বিভাগ, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়

তানভীর আহমেদ, প্রভাষক, স্থাপত্য অনুষদ, আহসানউল্লাহ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

গোলাম মোর্তোজা, সমন্বয়কারী

Born to Build
SHAH CEMENT

এক বছরে নানাবিধ কারণে এই সংখ্যাটা কমে গেছে। যার সঠিক ডাটা আরো কিছুদিন না গেলে পাওয়া যাবে না। কারণ ডেলিভারিটা না হওয়া পর্যন্ত বোঝা যাচ্ছে না। সেটার অনেকগুলো কারণ। ২০০৪ সালের শুরু থেকে এ পর্যন্ত প্রাইমারিলি এমএস স্টিলের যে দাম সেটা বিগত এক বছরের তুলনায় গড়পড়তা শতকরা একশ' ভাগ বেড়েছে। ২০০৩ সালের জানুয়ারিতে যে রডের দাম ছিল গড়ে২০ থেকে ২৩ হাজার টাকা তা ২০০৪ সালের জানুয়ারিতে এসে দাঁড়িয়েছিল ৪০ থেকে ৪৬ হাজার টাকায়। যেটা এই মুহূর্তে দাম সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপের কারণে বা কিছু আমদানি বাড়ার কারণে নেমে ৩৮-৩৯ হাজার টাকা হয়েছে। গ্রেড স্টিল, বিশেষত যেগুলোর গুণগত মান ঐভাবে অথেনটিকেটেড না, সেগুলো ৩০ থেকে ৩৪ হাজার টাকার মধ্যে পাওয়া যায়। কাজেই মূল্য কিন্তু এখনও সিগনিফিকেন্টলি চড়া। রিহ্যাবের একটা হিসাব মতে আমরা দেখেছিলাম যে এতে করে গড়পড়তা যেকোনো ফ্ল্যাটের দাম ৮ থেকে ১২ ভাগ বেড়ে যাবে। বলা যায়, ১০ ভাগ বেড়ে গেছে। এটার এফেক্টটা কিন্তু ক্রেতার ওপর পড়বে। এটা এমন সময় হলো যখন, মধ্যবিত্ত বা সীমিত আয়ের জনগোষ্ঠীর জন্য বিভিন্ন ডেভেলপাররা ফ্ল্যাট বানাচ্ছিলেন। ঢাকায় এখন অনেক ডেভেলপার আছেন যারা ৮০০ থেকে ১২০০ স্কয়ার ফিটে মধ্যে তাদের মেজর প্রোডাক্ট বিক্রি করছেন। এর থেকে নিচেও আছে। টাকার হিসাবে ৮ লাখ, ১০ লাখ, ১২ লাখ টাকার মধ্যে অনেক কোম্পানির হাতে ফ্ল্যাট আছে। এখন আরো একটি সুবিধা লিজিং কোম্পানিগুলো। পাঁচ-দশ বছর আগে হাউজিংয়ের জন্য ঋণ পাওয়ার সুযোগ খুব কম ছিল। সরকারি হাউস বিল্ডিং ফাইনান্স কর্পোরেশন ছাড়া। এখন তিনটা মেজর লিজিং কোম্পানি আছে। অনেক ব্যাংকও হাউজিং সেক্টরে ঋণ দিচ্ছে। এ কারণে রিহ্যাবের পক্ষ থেকে আমরা আশা করছিলাম যে আগামী বছরগুলোতে যদি এই ধারাবাহিকতা বজায় থাকতো তাহলে সীমিত আয়ের জনগোষ্ঠীকে ডেভেলপাররা প্রাইভেট সেক্টরে হাউজিং প্রোভাইড করতে সক্ষম হতো। কিন্তু এই যে আট-দশ ভাগ দাম বেড়ে গেল, এর কারণে কিন্তু এই জনগোষ্ঠী আর সেই ফ্ল্যাটগুলোকে টার্গেট করতে পারবে না। যেমন ১০ লাখ টাকা দিয়ে যিনি ফ্ল্যাট কিনবেন, তার কাছে ১ লাখ অনেক টাকা। যিনি ১০ লাখ টাকা বাজেট করেছেন, তার পক্ষে অতিরিক্ত ১ লাখ টাকা জোগাড় করা যথেষ্ট কঠিন।

মোর্তোজা : আপনারা যে মধ্যবিত্তকে টার্গেট করেছিলেন, দাম সেই মধ্যবিত্তের আওতার বাইরে চলে যাচ্ছে।

ড. তৌফিক : চলে যাচ্ছে না, গেছে। আর একটা কারণ হচ্ছে, আমাদের দেশে লিজিং কোম্পানির যে সুদের হার সেটা উন্নত বিশ্বের তুলনায় অনেক অনেক বেশি। বাংলাদেশে আমাদের আয় কম। কিন্তু হাউজিংয়ের চাহিদা আছে। মধ্যবিত্ত-নিম্ন মধ্যবিত্তকে যদি তেরো বা চৌদ্দ পার্সেন্ট বা ষোল-সতেরো পার্সেন্ট রেটে ঋণ নিয়ে বাড়ি কিনতে হয়, সেটা খুব কঠিন। উন্নত বিশ্বে সাধারণত ভাড়ার টাকায় মানুষ ফ্ল্যাট কেনে। সেটা ১৫ থেকে ২৫ বছরের লিজ দেয়া হয়। বাংলাদেশে লিজিং কোম্পানি আসার পর অনেক উন্নতি হয়েছে। সেটা মধ্যবিত্ত প্লাসের জন্য। কিন্তু মধ্যবিত্ত মাইনাসের জন্য সুদের হার সঠিক নয়। উপসংহারে এটাই বলা যায় যে, নির্মাণ সামগ্রীর দাম বাড়ার কারণে নির্মাণ ব্যয় বেড়ে গেছে। সুদের হার মধ্যবিত্ত বা নিম্ন মধ্যবিত্তের জন্য এখনও গ্রহণ উপযোগী নয়। আর এবারের বাজেটে ট্রান্সফার এবং রেজিস্ট্রেশন কস্ট বাড়ানো হয়েছিল। যদিও ওটা পরে উইথড্র করা হয়েছে। দেড় পার্সেন্ট ভ্যাট যোগ করা হয়েছে। আপাতদৃষ্টিতে দেড় পার্সেন্টকে খুব বেশি মনে হয় না। মাত্র দেড় পার্সেন্ট মনে হয় দেয়াই উচিত। কিন্তু এই দেড় পার্সেন্ট সংগ্রহ করার জন্য যে জটিলতা এবং অনিয়ম আর হয়রানি হয় সেটা কিন্তু শেষ পর্যন্ত ক্রেতার ঘাড়ে গিয়ে পড়ে। আমি মনে করি ট্যাক্স যদি বাড়াতে বা নিতে হয় তাহলে হতে হবে ওয়ান স্টপ সার্ভিস।

নাসরুল হামিদ

মোর্তোজা : আবার আপনার কাছে ফিরে আসবো। তার আগে আমরা এই কথাগুলোর সঙ্গে আরো কিছু জানতে চাইবো হামিদ গ্রুপের চেয়ারম্যান নাসরুল হামিদের কাছ থেকে।

নাসরুল হামিদ : আমরা চেষ্টা করছি যে আমাদের ব্যবসার মাধ্যমে একটা বৃহৎ অংশের আবাসন সমস্যার সমাধান হবে। দশ বছরের উন্নয়নটা কিন্তু গত এক বছরে হুমড়ি খেয়ে পঞ্চাশ শতাংশে নেমে এসেছিল। যে স্পিডটা ছিল, তা গত দেড়-দুই বছরে হঠাৎ করেই অনেকটা নেমে এসেছিল। এর কারণ হলো ক্রয় ক্ষমতার বাইরে চলে যাওয়া। একটি অ্যাপার্টমেন্টের রডের কথা বাদ দিলে বাকি সব কিন্তু আমদানি সংশ্লিষ্ট। একটি বিল্ডিংয়ের বেসিক ইন্ডাস্ট্রি কিন্তু আমরা তৈরি করতে পারি নাই। বিদেশে লো কস্ট হাউজিং একটা ইন্ডাস্ট্রিতে রূপ নিয়েছে। অর্থাৎ তারা ইন্ডাস্ট্রি প্রোডাক্ট হিসেবে ওয়াল তৈরি করে ফেলছে। তারা ছাদও তৈরি করছে। একটা অ্যাপার্টমেন্ট বানাতে চাইলে সব কিনতে পাওয়া যায়।

সেখানে ছয় মাসে একটা অ্যাপার্টমেন্ট তৈরি করে ফেলা যায়। এই অল্প সময়ে তৈরি করতে পারায় মূল্যটাও নিয়ন্ত্রণে থাকছে। আমাদের এখানে তো এটা হচ্ছে না। রডের কথা যদি বলি, এর বেসিক মেটিরিয়াল হচ্ছে পুরনো জাহাজ। আন্তর্জাতিক বাজারে পুরনো জাহাজ স্কেয়ার সিটি হয়ে গেছে। সবাই বলছে এটা মূলত চায়নার কারণে। চায়না তার ওয়ার্ল্ডের ৬০ ভাগ কনজামশন করে দিচ্ছে এই পুরনো জাহাজগুলোকে। সারা পৃথিবীতে পুরনো জাহাজ শর্টেজ হয়ে গেছে। আমাদের দেশে এই পুরনো জাহাজগুলো আসছে না বলেই কাঁচামালের স্বল্পতা দেখা দিয়েছে এবং রডের দাম বেড়ে গেছে। মার্কেটের যে অবস্থা। বাকি বেসিক মেটেরিয়াল, রঙ বা অন্য যা কিছু সবই আমদানি নির্ভর। একমাত্র ইট বাংলাদেশের মাটি দিয়ে তৈরি হয়। তার ওপর আবার সরকার ট্যাক্স, বিরাট অঙ্কের ভ্যাট চাপিয়ে দিয়েছে। তাদেরকে আবার পরিবেশ মন্ত্রণালয় থেকে বিভিন্ন রকম নীতিমালা গ্রহণ করার জন্য চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে। এতে করে

'রাজউক কম মূল্যে জমি অ্যাকোয়ার করে বেশি মূল্যে জমি বিক্রি করছে। আর আমাদের জমি বেশি দামে কিনে ওদের সঙ্গে মার্কেটে প্রতিযোগিতা করে সেটা বিক্রি করতে হচ্ছে। এটা বিশাল সমস্যা। একই সঙ্গে সরকার এবং ব্যবসায়ী ব্যবসা চালাতে পারে না। পৃথিবীতে এখন বিজনেস গ্লোবালাইজেশন যেটা হচ্ছে তা প্রাইভেট সেক্টরকে ডেভেলপ করার জন্য'

তাদেরও একটা কস্ট ইনক্রিস করে গেছে প্রাইজ।

ইটের দাম একেক মৌসুমে ১৫ থেকে ২০ ভাগ বেড়েছে। তারপর আছে বন্যা। এই বন্যায় অধিকাংশ ইটের ভাটা তলিয়ে গেছে। এসব কিন্তু এফেক্ট হয় হাউজিং শিল্পের সঙ্গে। প্রায় ৩৫০টি আইটেম এর সঙ্গে জড়িত। লিংকেজ ইন্ডাস্ট্রি হিসেবে যদি ধরি, লেবার তো সরাসরি জড়িত এর সঙ্গে। রড, সিমেন্ট, বালু এমনকি সামান্য ফার্নিচার ইন্ডাস্ট্রির, বিশাল একটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল গ্রুপ কিন্তু এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে। এটার ওপর সমস্যা হলে ওগুলোর ওপরও এফেক্ট হয়। যেমন

Born to Build
SHAH CEMENT

টাইলসের বেশ কিছু কোম্পানি গত পাঁচ বছরে বাজারে এসেছে। এটা এসেছে কিন্তু অ্যাপার্টমেন্ট তৈরি হচ্ছে বলেই। সরকারের উচিত এই ইন্ডাস্ট্রিকে যেভাবেই হোক বাঁচিয়ে রাখা। দু'হাত দিয়ে আমাদের সহযোগিতা করা উচিত। তেমনটা আমরা লক্ষ্য করছি না। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে গত দু'বছরে আমরা বিভিন্ন সেমিনার, সরকারি পর্যায়ে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীদের সঙ্গে একাধিক বৈঠক করছি। আমাদের সমস্যাগুলো তাদের জানাচ্ছি। বোঝাচ্ছি কী করলে কী হয়। একটা নীতিমালা তৈরি করার জন্য তারা প্রস্তুতি নিচ্ছে। হাউজিংয়ে নতুন নীতিমালা হচ্ছে। দুটো সেক্টরে ভাগ করা হয়েছে। একটা ম্যান আরেকটা হাউজিং সেক্টর। যে টাকা পাচ্ছেন তার কনস্ট্রাকশন সেক্টর থেকে। নীতিমালার ব্যাপারেও আমাদের সঙ্গে অনেকবার বৈঠক হয়েছে, আমাদের কথা তারা শোনেন। খুব কমই তা নীতিমালার সঙ্গে যোগ করেন। যাদেরকে নীতিমালা তৈরি করতে দেয়া হয়েছে তাদের একটা বড় অংশ 'রাজউক'-এর।

আবাসন শিল্পের সমস্যা থেকেও বড় সমস্যা রাজউক। রাজউক এখন দেশের একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। যারা কিনা আবাসন শিল্পের সমস্যা সমাধান করবে, তারা তো এখানে পলিসি মেকার হিসেবে কাজ করবে তাই না? প্রথম মন্ত্রণালয়, তারপর রাজউক। নগর পরিকল্পনা, নগর কোন দিকে যাবে ইত্যাদি। অর্থাৎ তারা নিয়ন্ত্রক হিসেবে থাকবেন। কিন্তু তারা বহু আগে থেকেই ব্যবসায়ী হয়ে গেছেন।

আমাদের সঙ্গে তারা প্রতিযোগিতা করছে। ১৯৬৪ সালে যখন ডিআইটি তৈরি হয়েছিল, তখন কিন্তু এ রকম ডেভেলপার ছিল না। রাজউক জমি অ্যাকোয়ার করছে। দশ বছর আগেও অনেকে টাকা জমা দিয়েছে। সে টাকা পাবে কি পাবে না সেটা তারা জানে না। সেটা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য কিন্তু কেউ নেই। তারা জবাবদিহি কার কাছে করবে, লোকই তো পাচ্ছে না। সেটা কোনো লটারির মাধ্যমে দেয়া হয় না। এ নিয়ে বহু প্রশ্নের সম্মুখীন হচ্ছে। চেয়ারম্যানের সঙ্গে আমাদের অনেকবার এটা নিয়ে তর্কবিতর্ক হয়েছে। আমরা যারা ব্যবসায়ী আছি, রাজউক আমাদের নিয়ন্ত্রক হিসেবে থাকুক। আমাদের তারা যে নীতিমালা দেবে, আমরা সেই গাইড লাইন নিয়েই চলতে চাই। রাজউক কম মূল্যে জমি অ্যাকোয়ার করে বেশি মূল্যে জমি বিক্রি করছে। আর আমাদের জমি বেশি দামে কিনে ওদের সঙ্গে মার্কেটে প্রতিযোগিতা করে সেটা বিক্রি করতে হচ্ছে। এটা একটা বিশাল সমস্যা। একই সঙ্গে সরকার এবং ব্যবসায়ী ব্যবসা চালাতে পারে না। এটা সম্ভব নয়। সারা পৃথিবীতে এখন বিজনেস গ্লোবালাইজেশন যেটা হচ্ছে তা প্রাইভেট সেক্টরকে ডেভেলপ করার জন্য। সারা পৃথিবীতে যেভাবে পলিটিক্যাল অর্থনীতি গ্রো করছে সে ধারায় কিন্তু সেটা পড়ে না। এগুলো বিরাট একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমরা নতুন জায়গায়, ঢাকার বাইরে যাচ্ছি না। নতুন শহর তৈরি করছি না কেন? কারণ এরকম কোনো পরিকল্পিত জায়গা তৈরি করছে না। রাজউক তৈরি করবে না। আমি ১৯৮৯ সাল থেকে ব্যবসা করি। প্রথম আমরা যে জায়গাটায় ব্যবসা শুরু করি, পরীবাগ প্রিয়প্রাঙ্গনে। সেখানে দুই বিঘা জায়গায় একটা পরিবার থাকতো। এখন সেখানে ৭০টা পরিবার থাকে। রাজউক সম্মতি দিচ্ছে। সরকারের তো উচিত ছিল এর সঙ্গে সঙ্গে সেখানকার যে ইনফার স্ট্রাকচার বাড়ানো। স্যুয়ারেজ লাইন ৬০ দশকে যেমন ছিল, এখনও তাই। যে ইলেকট্রিসিটি, যে ওয়াসা লাইন ছিল এখনও সেটাই আছে। আমরা কিন্তু বিরুদ্ধে বলতে চাচ্ছি না। বলতে চাই সম্পূর্ণ পরিকল্পনাটা সঠিক হলে আমাদের ব্যবসাটা আরো ভালো হতে পারে। এগুলো কিন্তু রাজউক দেখছে না। রাজউক আমাদের ব্যবসাটা স্কুইজ করার চেষ্টা করছে বিভিন্ন নীতিমালা, ট্যাক্স, ভ্যাট চাপিয়ে দিয়ে। সংগ্রহটাকে আরো কঠিন করার জন্য। তারা মনে করছে ডেভেলপাররা বোধহয় প্রচুর টাকা বানাচ্ছে। ব্যবসার এই জিনিসগুলোকে যদি তারা আরো সুবিধাজনক করতো, তাহলে ব্যবসার আকার বড় হতো, সরকারের খাতেও স্বাভাবিকভাবেই রেভিন্যু জমা হতো। এগুলোর দিকে তাদের নজর নেই। আজকে গাজীপুরে আমরা কেন অ্যাপার্টমেন্ট বানাবো না? যদি সেখানে ইনফ্রাস্ট্রাকচার থাকে, গাজীপুর থেকে যদি ৪০ মিনিটে ঢাকা আসা যায় তাহলে কেন করবো না? সারা পৃথিবীতেই তো এমন হচ্ছে। কেউ তো ডাউন টাউনে থাকতে চায়না এখন। সবাই আরবান সাইডে চলে যায়। আরো বড় একটা সমস্যা আছে রাজউকের বা আমাদের আবাসন শিল্পের। বিস্তারিত কোনো মাস্টারপ্ল্যান নেই। ঢাকা শহরের জন্যই কোনো ডিটেইল মাস্টারপ্ল্যান নাই। অথচ বিশাল অঙ্কের টাকা দিয়ে তারা মাস্টারপ্ল্যান আরম্ভ করেছিলেন। আলোর মুখ দেখলো না সেই মাস্টারপ্ল্যান। যার জন্য বিশাল সমস্যা দেখা দিচ্ছে।

ঢাকা শহরে আজ প্রায় এক কোটি বাড়তি লোক। দুই মিলিয়নের মতো লোক বস্তিতে বসবাস করে। যে গতিতে ব্যবসা-বাণিজ্য গ্রো করতে চায়, সরকারকে তো তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে হবে। সেই ইনফ্রাস্ট্রাকচার সেই প্ল্যানিং দিতে হবে। তাহলে একটা ভালো জিনিস পাওয়া সম্ভব। এটার উপকার কারা পাবে? এই যে লিংকেজ ইন্ডাস্ট্রিগুলো আছে তারা লাভবান হবে। আমাদের সামগ্রিক জিডিপি রাইজ করবে। সবকিছু পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত। রিহ্যাব সভাপতি যেটা বলছেন, ১.৫ শতাংশ যে ভ্যাট সংগ্রহ করা হচ্ছে, সেটা কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমরা ১৫ শতাংশ দিচ্ছি। ৬০ ভাগ বাদ দিয়ে বাকি যে ৪০ ভাগ থাকছে, তার ১৫ শতাংশের ১.৫ ভাগ আসে। হিসাবটা কিন্তু এ রকম।

একজন ক্লায়েন্ট অ্যাপার্টমেন্ট কিনলো, সে ১০ টাকা দিল। সঙ্গে সঙ্গে ১০ টাকার ওপর ১.৫ শতাংশ কেটে আমরা রশিদ দিয়ে চালানে জমা করে দিচ্ছি। যখন এই ক্লায়েন্ট ছয় মাস পর চিন্তা করলো সে অ্যাপার্টমেন্টটা ক্যানসেল করতে চায়, তখন ক্যানসেল করে দিচ্ছেন, কিন্তু আমরা ভ্যাটটা রিটার্ন করতে পারি না। সরকারি মধ্যে টাকা রিটার্নের কোনো ব্যবস্থা নেই। নেয়ার ব্যবস্থা আছে। তখন আমরা নিজেদের পকেট থেকে দিচ্ছি, সরকারের পক্ষ থেকে তো দিতে পারছি না। সরকারের কাছে আমাদের প্রস্তাব ছিল এই ভ্যাটটা ক্লায়েন্ট যখন রেজিস্ট্রেশন করে, তখন যেন নেয়া হয়। ওনারা শুনছেন, বসতে যাচ্ছেন। সরকারের রেভিন্যু সংগ্রহে যত বেশি জটিলতা তৈরি করা যায়, রেভিন্যু সংগ্রহটা তত বেশি কমে আসে।

মোর্তোজা : সুবাস্তু ডেভেলপমেন্ট লিমিটেড অনেক দিন ধরে আবাসন ব্যবসার সঙ্গে সম্পৃক্ত। এই যে মাস্টারপ্ল্যানের কথা বলা হলো, এর ফলে আপনারা কীভাবে সমস্যায় পড়ছেন। সুবাস্তুর নির্বাহী পরিচালক সালাউদ্দিন আহমেদের কথা শুনবো।

ড. তৌফিক এম. সেরাজ

'১৯৭১ সালে যখন বাংলাদেশ স্বাধীন হয়, তারপর ১৯৭২ সালে আমাদের তৎকালীন রাজনীতি, ব্যুরোক্র্যাট, পেশাজীবীদের বোঝা উচিত ছিল শহরটা কোথায় যাচ্ছে। আমরা ২,৩,৫ বছরের মধ্যে ওই শহরের বৃদ্ধির ট্রেন্ডটা ভিজ্যুয়ালাইজ করতে পারিনি। এটাই প্রাথমিক দায়িত্ব ব্যুরোক্র্যাট এবং রাজনৈতিক নেতৃত্বের'

Born to Build
SHAH CEMENT

সালাহউদ্দিন আহমেদ : হ্যাঁ। রাজউকের কোনো নীতিমালা নেই। মাস্টারপ্ল্যান নেই। আমার আগের বক্তা যে বিষয়টা বারবার বলেছেন। কোন এলাকায় কয়তলা ভবন নির্মাণ করা যাবে তার কোনো স্পষ্ট ধারণা নেই। এখন যেমন নিয়ম হয়েছে যে ধানমন্ডিতে ছয় তলার বেশি ভবন করা যাবে না। গুলশান-বনানীতে আছে ছয় তলার উপরে হবে না। কিন্তু লালমাটিয়া, মোহাম্মদপুর, মিরপুর- এসব এলাকায় রাজউকের কোনো নীতিমালা নেই, এখানে কয়তলা পর্যন্ত করা যাবে। আমার মনে হয় ২০ থেকে ২২টা প্ল্যান রাজউকে জমা আছে শুধু লালমাটিয়া এলাকার জন্য। বিভিন্ন ডেভেলপারের। তার মধ্যে আমাদেরও কয়েকটা প্ল্যান আছে। কিন্তু রাজউক এখনও দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ভুগছে। এখানে ৬ তলা নাকি ৮ তলা অ্যাপ্রুভাল দেবে। যেমন এক বছর আগেও আমরা ৮ তলার অ্যাপ্রুভাল চেয়েছিলাম দুতিনটা প্ল্যানের। এটা এক বছর ধরে রাজউকে জমাই পড়ে আছে। এতে করে আমরা যেমন সাফার করছি। তেমনি আমাদের সঙ্গে যারা এগ্রিমেন্ট করেছে তারাও সাফার করছে, ধৈর্যহারা হচ্ছে। রাজউক এখনও সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি লালমাটিয়ায় কয়তলার অ্যাপ্রুভাল দেবে। গতকাল পর্যন্ত আমি খবর জানি যে ফাইলগুলো চেয়ারম্যানের কাছ থেকে সেক্রেটারির কাছে গেছে। কিন্তু সঠিকভাবে জানাতে পারেননি যে ফাইলগুলো কবে রিলিজ করা হবে। যদিও বোর্ডে মোটামুটি একটা সিদ্ধান্ত হয়েছে যে ৮ তলার অ্যাপ্রুভাল দেয়া হবে; তবে সবগুলো নয়, কয়েকটা। আমরা যদি ওয়ান স্টপ সার্ভিসের মধ্যে অর্থাৎ রাজউক, ডেসা, ওয়াসা, গ্যাস, ফায়ার সার্ভিস, এনভায়ারমেন্ট বিভিন্ন জায়গা থেকে যে আমাদের অ্যাপ্রুভাল নেয়া লাগে, ছয় তলার উপরে গেলেই ৯-১০টা ডিপার্টমেন্ট থেকে আমাদের অ্যাপ্রুভাল নেয়া লাগে। এতে প্রচুর সময় যায়, টাকা যায়। এসব কারণে একটা প্রোজেক্ট সাইন করার পর থেকে প্ল্যান পাস করে অ্যাপ্রুভাল পর্যন্ত প্রচুর সময়, প্রায় একবছর চলে যায়। ক্রেতাদের সঙ্গে যখন আমরা এগ্রিমেন্ট করি, তখন একটি নির্দিষ্ট সময় থাকে। দুই বা আড়াই বছর।

এজন্যই হয়তো বিভিন্ন সময় অভিযোগ শোনা যায় যে, সময় মতো হ্যান্ডওভার করতে পারে না ডেভেলপাররা।

হ্যাঁ, এটা একটা বিরাট কারণ। যখন আমাদের সঙ্গে তাদের এগ্রিমেন্ট হয়, পজেশন দেয়ার পর থেকে একটা সময় ধরা হয়। কিন্তু পজেশন দেয়ার পর ৬ থেকে ৯ মাস চলে যায় আমাদের এই রাজউকের ফর্মালিটিজে। এ সময়টা আমরা পরে আর মেকআপ করতে পারি না। এজন্যই প্রায় ডেভেলপারই সময় মতো ফ্ল্যাট হ্যান্ডওভার করতে পারেন না। তাতে আমাদের বদনাম হয় মার্কেটে। গুড উইলটা নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু ইন্টারনাল সমস্যাগুলো যে আমরা ফেইস করি সেটা আমরা ছাড়া বাইরের কেউ বোঝে না। জমির মালিক, ক্রেতা কাউকেই আমরা কনভিন্স করতে পারি না। তারা তো এগ্রিমেন্ট অনুযায়ী কাজ চায়। এটা একটা বড় সমস্যা। আর ম্যাটেরিয়াল প্রাইজ যেটা সম্পর্কে আগেও আলোচনা হয়েছে, সেটাও বড় একটা সমস্যা। এটার জন্য অ্যাপার্টমেন্ট, দোকান, অফিস স্পেস সবকিছুর দাম বেড়ে যায়। রেজিস্ট্রেশনের ক্ষেত্রে ডাবল রেজিস্ট্রেশন আরো একটি সমস্যা। একবার যার নামে রেজিস্ট্রেশন হয় তিনি যদি সেটা ট্রান্সফার করেন, তাহলে আবার রেজিস্ট্রেশন কস্ট দিতে হয়। এতে যেটা হয়, কেউ যদি একটা অ্যাপার্টমেন্ট কিনে সেটাকে ইনভেস্টমেন্ট হিসেবে রেখে দেয়, কিছুদিন পর সেটা বিক্রি করতে গেলে তো করা যায় না। এটাও ভীষণ সমস্যা। আর হাউজিংয়ের জন্য যে ঋণ প্রাইভেট সেক্টর থেকে পাওয়া যাচ্ছে যেমন ডিবি এইচ, ন্যাশনাল হাউজিং- তাদের সুদের হারটা পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনায় বেশি। আর একটা বিষয় খুবই জরুরি। তা হচ্ছে প্রবাসী যারা তাদের ঋণ পেতে খুব কষ্ট করতে হয়। পানই না অধিকাংশ ক্ষেত্রে। বিভিন্ন কারণে তাদের ঋণ দেয়া হয় না। যার কারণে মনে হয় বড় একটা অংশ আমরা মিস করছি। এটা একটু ভেবে দেখা উচিত।

সালাউদ্দিন আহমেদ

মোর্তোজা : ঋণের ক্ষেত্রে কিছু কথা আছে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই আকর্ষণীয় বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে বোঝানোর চেষ্টা করা হয় যে মাত্র ৩০ শতাংশ দিলে বাকি ৭০ শতাংশ ঋণ গ্রহণ করে একটি অ্যাপার্টমেন্টের মালিক হওয়া সম্ভব। আমরা জানি সরকারি, বেসরকারি উভয় ক্ষেত্রেই ঋণ পাওয়া একটি জটিল প্রক্রিয়া। ন্যাশনাল হাউজিংয়ের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আনসার উদ্দিন আহমেদ যদি বলেন উল্লিখিত অভিযোগ এবং প্রবাসীদের ঋণ পাওয়া না পাওয়ার বিষয় সম্পর্কে।

আনসার উদ্দিন আহমেদ : সমস্যাগুলো আমি চিহ্নিত করবো এবং তার পাশাপাশি যে সম্ভাবনাগুলো আছে সেটাও আলোচনা করার চেষ্টা করবো। এতোক্ষণ আমরা অনেক সমস্যার কথা শুনলাম। এগুলো সব ভুক্তোভোগীর সমস্যা। ব্যবসা করতে গিয়ে এবং উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে গিয়ে যে সমস্যার মুখোমুখি তারা হচ্ছেন সেগুলোই তুলে ধরা হয়েছে। আমরা ঋণ দেই যারা বাড়ি কিনতে আসে। আমি বলবো না যে সব সমস্যার সমাধান আমার কাছে আছে। তবুও সমস্যার কথা না বলে সম্ভাবনার কথাটাই বলতে চাই। আমরা সবাই জানি আমাদের দেশে হাউজিংয়ের যে অবস্থা আছে তাতে একটা পরিসংখ্যানও দেখেছি, হাউজ হোল্ড যে ইউনিট দরকার তার তুলনায় সাপ্লাই কম। অর্থাৎ ১০ লাখ আমাদের চাহিদা, যোগান আছে ৭ লাখ। ঘাটতি আছে ৩ লাখ। এটা ব্যাপক জনগোষ্ঠীর জন্য একটা বড় সমস্যা। এই সমস্যা সমাধানের জন্য তৎকালীন ইস্ট পাকিস্তানে ৪০-৪৫ বছর আগেই হাউজ বিল্ডিং ফাইন্যান্স করপোরেশন হয়েছে। এটা অত্যন্ত সীমিত পরিসরে হলেও ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, বগুড়া, সিলেট এই ছয়টা জেলা শহরে তারা অফিস করে ঋণ দেয়ার চেষ্টা করেছে। আমি গত ছয় বছরের অভিজ্ঞতা থেকে বলছি, ১৯৯৮ থেকে শুধু হাউজিং ফাইন্যান্সের জন্যই দু'টি ইনস্টিটিউশন হয়েছে বেসরকারি ক্ষেত্রে। একটা হলো ডেল্টা ব্র্যাক হাউজিং আরেকটা ন্যাশনাল হাউজিং আর আইডিএলসি। এই তিনটা প্রতিষ্ঠান কিছু কিছু ক্ষেত্রে ঋণ দিচ্ছে। এখানে বিজ্ঞাপনের কথা এসেছে যে ৭০%

'কোন এলাকায় কয়তলা ভবন নির্মাণ করা যাবে তার কোনো স্পষ্ট ধারণা নেই। এখন যেমন নিয়ম হয়েছে যে ধানমন্ডিতে ছয় তলার বেশি ভবন করা যাবে না। গুলশান-বনানীতে আছে ছয় তলার উপরে হবে না। কিন্তু লালমাটিয়া, মোহাম্মদপুর, মিরপুর- এসব এলাকায় রাজউকের কোনো নীতিমালা নেই, এখানে কয়তলা পর্যন্ত করা যাবে'

ঋণের ব্যবস্থা আছে। এটা ডেভেলপাররাই করেন। আমাদের কাছে রেফার করেন। আমাদের কাছে গত ছয় বছরের যে পরিসংখ্যান আছে ডিবিএইচ সাড়ে চার হাজার ছাদের ব্যবস্থা করবে। ন্যাশনাল হাউজিং আড়াই হাজারের মতো। আর আইডিএলসি এখন পর্যন্ত ১২০০-র মতো বাড়ির ব্যবস্থা করেছে। সব মিলিয়ে প্রায় আট হাজারের মতো বাড়ির ব্যবস্থা আমরা এই তিনটি প্রতিষ্ঠান করেছি। সরকারি খাতের যে হিসাব আমার কাছে আছে তা হচ্ছে, গত

Born to Build
SHAH CEMENT

চল্লিশ বছরে হাউস বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন প্রায় ৩২ হাজার ইউনিট প্রোভাইড করতে পেরেছে। এই হচ্ছে ফর্মাল ইনস্টিটিউশনের পক্ষ থেকে পাওয়া ঋণ। আর বিভিন্ন ব্যাংক থেকে ব্যক্তিগতভাবে পাওয়া স্টাফ লোন আছে। সরকারি প্রতিষ্ঠানে স্টাফ লোন আছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকদের জন্য ১০০ মাসের বেতনের স্টাফ লোন আছে। সেভাবে ওইটাও কিন্তু ইজ আ পার্ট অব দ্য টোটাল ফাইন্যান্স মার্কেট। সেটার সুদের হার বিভিন্নভাবে বিভিন্ন রকম তৈরি করা যায়। সালাহউদ্দিন সাহেব যেটা বললেন, আমাদের প্রাইভেট সেক্টরে যারা গৃহঋণ প্রদান করে থাকেন তাদের সুদের হার অত্যন্ত বেশি। আমি নিজে কয়েকশ' পারসেন্ট এটার সঙ্গে একমত প্রকাশ করছি। আমি দেখেছি আমেরিকায় এখনও হাউজ, হোম মর্টগেজের জন্য যে ঋণ দেয়া হয় সেটার কনসেপ্টটা হচ্ছে লোনই তার ক্যারেকটার ইনকাম, এলাকা, সাইজের ওপর ডিপেন্ড করে সুদের হার নির্ধারণ করা হয়। কোথাও সাড়ে তিন আছে, কোথাও চার আছে। সেখানে ডাবল ডিজিট নাই। হোম মর্টগেজটা যেহেতু ওয়ান অব দ্য ফান্ডামেন্টাল লিডস অব দ্য পিপল, সুতরাং সেটা ওরা ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ডে বা ক্যাপিটালিস্ট ওয়ার্ল্ডে সাবসিডির কোনো ব্যাপার নাই। দে ডু নট সাবসিডাইজ। বাট দে ডু নট চার্জড কস্ট অব দ্য কস্ট অব ফান্ড। ধরেন কস্ট অব ফান্ড যদি এখন একটা কেমিকেল ব্যাংকের তিন হয়, তারা সাড়ে তিনের মধ্যে এসে ঋণ হিসেবে ওটা ছেড়ে দেয়। তারা বেশি ব্যবসা করে কম লাভ করে, বেশি লাভ করতে চায়।

মোর্তোজা : আমাদেরটা এতো বেশি কেন?

আনসারউদ্দিন : আমাদের ফিন্যানশিয়াল সেক্টরের যে কোম্পানিগুলো, তাদের কস্টটা চারভাবে আসে। একটা হচ্ছে মালিকদের দেয়া ক্যাপিটাল, দ্বিতীয়টা ক্লায়েন্টদের ডিপোজিট, তৃতীয়টা ব্যাংকগুলো থেকে ফাইন্যান্স আর একটা আমরা ধরে রেখেছি যে সেন্ট্রাল ব্যাংকের কাছ থেকে বা সরকারের কাছ থেকে কোনো সাবসিডাইজ পায়। সেটা আমরা কখনোই পাইনি। তবে কিছু কিছু অর্গানাইজেশন ইন্টারন্যাশনাল কিছু সফট লোন আমরা নিজেদের মধ্যে দিয়েছি।

হামিদ : কস্ট অব ফান্ড ইজ হাই।

আনসারউদ্দিন : আমাদের সাড়ে দশ থেকে বারো হচ্ছে কস্ট অব ফান্ড। সুতরাং আড়াই থেকে তিন পার্সেন্ট যদি আমরা মার্জিন করি, ম্যানেজমেন্ট ফিসহ সব মিলিয়ে দেখা যায় সাড়ে তেরো থেকে চৌদ্দ হয়ে যাবে। সুখের কথা এই যে, আমি সম্ভাবনার কথা বলছি। সরকারের প্রতিনিয়ত সেন্ট্রাল ব্যাংকের ওপর চাপ আছে যে, তারা যেন সিঙ্গেল ডিজিটের মধ্যে হোম মর্টগেজ ফান্ডটা নিয়ে আসে। তারা শুরু করেছে। যেমন- ইসলামী ব্যাংক, পূবালী ব্যাংক, ডাচ বাংলা ব্যাংক, এই তিনটা ব্যাংক হাউজ বিল্ডিংয়ের জন্য সুদের হার কমিয়েছে। বারো সাড়ে বারো, তেরো করেছে। হাউজ বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশনের সুদের হার তুলনামূলকভাবে কম। কিন্তু ঋণ না থাকলে তো লেস করে লাভ নাই। আমরা ইন লাইন উইথ আ গভর্নমেন্ট ডিসিশন, ইন লাইন উইথ দেয়ার লেসার কস্ট অব ফান্ড আমরা ইতিমধ্যেই সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে ডিবিএইচ, ন্যাশনাল এবং আইডিএলসি আমরা এ বছর পহেলা বৈশাখ উপলক্ষে যে বিশেষ ছাড় দিয়েছিলাম সেখানে আমরা তেরো করেছি। কিছু কিছু প্রতিষ্ঠান আছে যারা এখনও রান করছে। সরকারের একটা চাপ আছে ২০০৪-এর ডিসেম্বরের মধ্যে কমার্শিয়াল ব্যাংকগুলোকে রেট অব ইন্টারেস্ট দশের মধ্যে আসতে হবে।

মোর্তোজা : প্রবাসীদের জন্য সবারই আলাদা করে একটি গুরুত্ব থাকে। প্রবাসীদের লক্ষ্য করে নিউইয়র্কে একটি মেলা করতে যাচ্ছে রিহ্যাব। প্রবাসীরা ঋণ নিতে চাইলে কিভাবে নেবে?

আনসারউদ্দিন : আমি ১৫টা কেসের একটা অ্যানালাইসিস করেছি। বিদেশ থেকে ঋণ নিয়েছে। একটা প্রোজেক্টের ওপর অ্যানালাইসিস করেছি। তাদের মধ্যে ২ জন ঋণের জন্য দরখাস্ত করেছে। ১৫-এর মধ্যে ২। তার মানে ১০০-এর মধ্যে ৫০-এরও কম। প্রবাসীরা ঋণ চায়ই না।

হামিদ : আমার মনে হয় প্রবাসীরা ভয় পায় ইন্টারস্টের পার্সেন্টিজ দেখে।

মোর্তোজা : ভয় পাওয়ার বিষয়টা হয়তো আছে। প্রক্রিয়াগত জটিলতাও আছে। যিনি টোকিও, নিউইয়র্ক বা রিয়াদে থাকেন, তিনি কাগজপত্রের সমস্যা কিভাবে সমাধান করবেন। এটাও হয়তো অনুৎসাহিত হওয়ার কারণ। প্রবাসীদের বড় একটা অংশ থাকেন মালয়েশিয়া, মিডল ইস্টে। তাদের আয় কিন্তু টোকিও, নিউইয়র্ক প্রবাসীদের মতো নয়। সুতরাং তারাও সীমিত আয়ের মানুষ। তারাও ঋণ নিয়ে বাড়ি করতে চান। তাদেরকে ঋণ দেয়ার ক্ষেত্রে প্রক্রিয়াগত জটিলতা দূর করার কোনো পথ আছে কি না?

আনসারউদ্দিন : আমরা যদি কমিউনিকেশনটা সহজ করতে পারি, যেমন আমাদের কোম্পানির ওয়েবসাইট যদি দিতে পারি। আমাদের তথ্যগুলো যদি পৌঁছে দিতে পারি। এখন যেটা আছে, সেটা ওয়েবসাইটে তথ্য দেয়া আছে। তারা ডাউন লোড করে দেখেন। আমাদের এখানে ফরম ফিলাপ করে পাঠান। কিন্তু সাধারণভাবে হিসাব করলে প্রবাসীরা ঋণের ব্যাপারে আমাদের ফিন্যান্স বডির কাছে সে রকম সাড়া পাচ্ছে না। যিনি কনট্রাক্ট পার্সন তিনি তার ওপর নির্ভর করতে পারছেন না। অনেক সময় দেখা যায় প্রবাসীরা তাদের অত্যন্ত পরিশ্রম করে আয় করা অর্থ নিজেদের আত্মীয়স্বজনকে দিয়েও লেনদেন করতে ভরসা পান না। সেজন্য আমরা যেটা করি, একটা কো অ্যাপ্লিকেন্ট চাই। হু উড বি হেয়ার ইন বাংলাদেশ। কিন্তু অনেকে নিজের স্ত্রীকেও নমিনি করতে চান না। শেষ পর্যন্ত তিনি থাকবেন কিনা বা বিপদ-আপদের সময় এটা থাকবে কিনা এমন অনেক প্রশ্ন তৈরি হয়। আমি যেটা বলতে চাই, কিছু সমস্যা তাদের আছে। কিন্তু মেজর সমস্যা আমাদের।

আনসার উদ্দিন আহমেদ

'সাধারণভাবে হিসাব করলে প্রবাসীরা ঋণের ব্যাপারে আমাদের ফিন্যান্স বডির কাছে সে রকম সাড়া পাচ্ছে না। যিনি কনট্রাক্ট পার্সন তিনি তার ওপর নির্ভর করতে পারছেন না। অনেক সময় দেখা যায় প্রবাসীরা তাদের অত্যন্ত পরিশ্রম করে আয় করা অর্থ নিজেদের আত্মীয়স্বজনকে দিয়েও লেনদেন করতে ভরসা পান না'

মোর্তোজা : অনেকক্ষণ ধরে আমরা আলোচনা শুনছি। এবার আমরা বাংলাদেশ প্রেকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থাপত্য অনুষদের সহযোগী অধ্যাপক ড. শায়ের গফুরের থেকে কিছু শুনতে চাইবো।

ড. শায়ের গফুর : আমরা আলোচনার বিষয়বস্তুর দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখবো আবাসন শিল্পের যে ক্ষেত্র, খাত এবং ভোক্তা, সে অনুযায়ী কিন্তু ভিন্নতা পায়। মানে হাউজিংয়ে জমি, উপকরণ, অর্থ এগুলো বড় বড় আইটেম। আমরা খাত যদি আলোচনা করি, বিবেচনায় আনি, তবে আবাসনের কিন্তু সরকারি এবং বেসরকারি দুটো খাত চলে আসে। আর একটু দূরে গেলে প্রাতিষ্ঠানিক-অপ্রতিষ্ঠানিক দিকগুলোও চলে আসে। এই যে ব্যাপক পরিসর আবাসনের, তা কিন্তু অল্প

Born to Build
SHAH CEMENT

একটা স্লাইস নিয়ে আজকে আমরা আলোচনায় ফোকাস করছি।

আমি একজন শিক্ষক, একজন গবেষক হিসাবে কিছু সমস্যা এবং সম্ভাবনার কথা বলবো। আমার কথার ব্যাকগ্রাউন্ড হিসাবে বলতে চাই, আজকের রিয়েলিটি হচ্ছে- বেসরকারি খাতে যারা বিনিয়োগকারী আছেন ডেভেলপররা তারা যথেষ্ট সুসংবদ্ধ। তারা যথেষ্ট ব্যাপকতায় আবাসন শিল্পের চাহিদা মেটাচ্ছেন। এটা একটা স্বীকৃতি সত্য। বেসরকারি খাতের উত্থানটা হলো এই উত্থানেই কিন্তু একটা ঐতিহাসিক বা অতীত বোধহয় মনে রাখা উচিত, এটা যদি বিবেচনায় রাখি তাহলে সমস্ত আলোচনাটা আমাদের সঠিক পরিসরে হতে পারবে। অর্থাৎ পুঁজির যে সঞ্চালন। বেসরকারি খাতের যে উত্থানটা আমরা দেখবো সেটা এক সময় কিন্তু শুধু ডেভেলপাররাই এসেছিল। কিন্তু পরবর্তীতে দেখা যাচ্ছে গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ চলে এসেছে। এক খাত থেকে যে উদ্বৃত্ত সেটা আরেকটি খাতে যেমন জমি বা বাড়ি করার প্রচেষ্টায় নিয়োজিত হলো। এটা খুব ভালো। আবাসন শিল্পের একটা বহুমাত্রিকতাও আছে। সেক্টরে বেড়ে যাওয়া। এক সেক্টর থেকে আরেক সেক্টরে, গ্রুপ ইন্ডাস্ট্রির মধ্যে ইন্টার সেক্টরের যে ট্রান্সফার অব ক্যাপিটাল হচ্ছে এটার সঙ্গে বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক পরিসরে ব্যবসা-বাণিজ্য হচ্ছে তা সম্পৃক্ত। একই সঙ্গে পণ্য উৎপাদনের সঙ্গে। ভোক্তরা যে জিনিসগুলো কিনছে সেই ভোক্তাদেরও কিন্তু আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের যে সম্পৃক্ততা সেটা বিবেচনায় আনতে হবে। এটা আমাদের পলিসি লেভেলের যে বড় বড় আলোচনা সেখানে থাকলে বোধহয় আমরা কনটেক্সটা ধরতে পারবো। আমাদের আবাসনের অনেক সমস্যা আমরা জানি। আমার ব্যক্তিগত ধারণা, বেশির ভাগ সমস্যা ইনহেরিট প্রবলেম না। উইথ ইন ইটস ওউন অরিজিন। অর্থাৎ সমস্যাগুলো জেনেরিক না। ঐ যে বললাম, জমি, অর্থ এবং উপকরণ। বেশির ভাগ সমস্যা অরোপিত। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনেক বড় ভূমিকা আছে। একটি উদাহরণ দিয়ে যদি বলি- মালঞ্চ থেকে একটি মোগলাই পরোটার দাম ২০ টাকা। আর মোহাম্মদপুরের একটি দোকান থেকে কেনা যাবে ১২ টাকায়। স্বাদে কোনো তারতম্য নেই। বরং কেউ কেউ বলবেন যে মোহাম্মদপুরেরটাই অরজিনাল? স্বাদ ভালো। তাহলে দামে তারতম্য কেন? মালঞ্চের যে মালিক তার ওপর কি কোনো আরোপিত খরচ আছে? অনেকেই বলবেন হ্যাঁ। ওই আরোপিত খরচটা কিন্তু ভোক্তা বহন করে। আমরা জানি ব্যবসায়ীদের অনেক সমস্যা, অনেককে সন্তুষ্ট করতে হয়। এসব জিনিসের যে ইমপ্লিকেশন তা কিন্তু ভোক্তা পর্যায়ে চলে আসে। এ খরচটা যেন ভোক্তা বহন না করে আমাদের সেটাও দেখতে হবে। আমার যেহেতু স্থাপত্য এবং পরিকল্পনা সম্পর্কে আগ্রহ আছে, তো সেই পরিপ্রেক্ষিতে আবাসন শিল্পের সম্ভাবনা সম্পর্কে মোটা দাগের কিছু কথা বলতে চাই। এগুলো নিয়ে পরবর্তীতে ব্যাপক বিতর্ক এক আলোচনা হতে পারে। প্রথমেই বলেছি আরোপিত সমস্যাটা মোকাবেলা করতে পারে। সে ব্যাপারে একটা রেগুলেটরি বডিও থাকতে পারে। যারা বেসরকারি পর্যায়ে আছেন তারা মূল্য সঠিকভাবে নির্ধারণ হচ্ছে কিনা অর্থাৎ কনজিউমার গ্রুপ তাদের মূল্যের সঠিক প্রতিদান পাচ্ছেন কি না, সার্ভিস পাচ্ছেন কি না, সেটাও কিন্তু দেখা প্রয়োজন। সে ব্যাপারে একটা নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার উপস্থিতি আজ প্রয়োজন, এতোদিন হয়তো হয়নি কিন্তু আজ আমাদের প্রয়োজন। আমরা জানি কিছু কিছু স্থপতি পত্রিকায় লিখে আবাসন কেনার ব্যাপারে কিসব জিনিস কিনতে হবে সে সম্পর্কে অভিমত দেন। এটা নিঃসন্দেহে ভবিষ্যৎ ভোক্তার যথেষ্ট উপকার করে থাকে। এই যে সার্ভিসগুলো একটিই নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা থেকে, সরকারি অথবা বেসরকারি খাত থেকে আসতে পারে। আমরা দেখছি যে বাড়ির দাম বেড়ে যাচ্ছে। তার মানে বাড়ি নির্মাণের বিল্ডিংয়ের মধ্যে ব্যবহৃত যে মেটেরিয়াল আছে সেগুলোর ফলেই বাড়ছে। আমাদের দেখতে হবে যে আবরণে এই আবাসনের বিপণনটা যে পারফেকশনে তৈরি করা হচ্ছে যে আমার বাড়িটা এতো সুন্দরভাবে তৈরি করা হবে এবং ক্রেতার মধ্যে যে হাই এক্সপ্রেকটেশন তৈরি করা হচ্ছে এর ফলে কি প্রয়োজনের অতিরিক্ত বিল্ডিং এবং ফিনিশ মেটেরিয়ালের ফলে মূল্য বেড়ে যাচ্ছে কি না। অর্থাৎ এই এক্সপেকটেশনটা কি আর একটু ডাউন টু আর্ন? উইদিন রিয়েলিস্টিক ক্যাপসিটি নিয়ে আসা যায় কিনা। আমি খুব সুন্দর একটা কিচেন দেখলাম। কিন্তু সেটা তো অবশ্যই ১২ লাখ টাকার কিচেন নয়। কিন্তু আমার প্রত্যাশা থেকে গেল যে ওটাই আমার কিচেন। সেজন্য বিপণনের ব্যাপারে একটু বাস্তবিকতায় আসা উচিত। তারপর নাগরিক যে সুযোগ-সুবিধা আছে তার বিকেন্দ্রীকরণ করতে হবে। ধানমন্ডি এবং গুলশানের মতো এলাকায় বাড়ির চাহিদা এজন্য যে, এখানে নাগরিক সুযোগ- সুবিধা, বাড়ির অবকাঠামোগত সুবিধা বিদ্যমান। যা অন্যান্য জায়গায় নেই। ঢাকা শহরেই যদি আমরা এই নাগরিক সুযোগ সুবিধাগুলো সুষমভাবে বিকেন্দ্রীকরণ করে দিয়ে দিতে পারি, তাহলে বেসরকারি যে প্রতিষ্ঠানগুলো আছে সেই সমস্ত জায়গায় যাবে। আমার ধারণা, এর ফলে জমির দামের যে তারতম্যটা হবে তার সুবিধাটুকু বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো নিতে পারে। একই সঙ্গে ক্রেতাও উপকৃত হচ্ছে।

আমাদের নাগরিক জীবনযাত্রা যথেষ্ট আধুনিক এবং দ্রুত হচ্ছে। আমাদের সঙ্গে স্কাই মিডিয়া, স্কাই চ্যানেলের যে সম্পৃক্ততা সেটাও একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। একজন মানুষের যে জীবনযাত্রা সেক্ষেত্রে আবাসনের ব্যাপারে তার বিভিন্ন রকম চাহিদা হয়। এই লাইফ সাইকেলের রেসপন্ডের যে হাউজিং সেটা বিদেশে বিদ্যমান। আমি যখন বিবাহিত এবং নিঃসন্তান তখন আমার এক রকম আবাসনের চাহিদা। যে মুহূর্তে বাচ্চা হলো চাহিদাটাও পাল্টে গেল। জীবনচক্রের বিভিন্ন পর্যায়ের যে আবাসন চাহিদা, আমরা কিন্তু সে অনুযায়ী আবাসন তৈরি করছি না। কিন্তু সেটাই হওয়া উচিত। এ ক্ষেত্রে বোধহয় প্রধান প্রতিবন্ধকতা সেটা হচ্ছে বর্তমানে হাউজিংকে দেখা হচ্ছে প্রপার্টি। কমডিটি হিসেবে নয়। ট্র্যান্সফারের যে জটিল প্রক্রিয়া এটাও দূর করতে হবে। হাউজিং মার্কেট এবং ট্রান্সফারেবল কমডিটি হিসেবে নিয়ে আসতে হবে । সে ক্ষেত্রে সরকারকে বুঝতে হবে আজকের যে প্রয়োজন আমার সেটা শেষ হয়ে গেলে আমি যেন আর একজনকে দিয়ে দিতে পারি। এই দিয়ে দেয়াতে আরেকটা বাড়ি হচ্ছে না। কিন্তু এক্সিসটিং হাউজিং স্টকের রিপিটেশন হচ্ছে না। এই লাইফ সাইকেল অনুযায়ী হাউজিংটা চলে আসা উচিত।

মোর্তোজা : স্থপতি তানভীর আহমেদ অনেকক্ষণ ধরে শুনছেন। কিছু বলছেন না। এবারের তার থেকে কিছু শুনতে চাইছি।

তানভীর আহমেদ : প্রথমে আমরা বাংলাদেশের বিদ্যমান অবস্থার দিকে দৃষ্টি দেই। দেশের জনসংখ্যা প্রায় তেরো কোটির মতো। যারা শহরে বাস করছে এ রকম প্রায় ৩০ মিলিয়ন লোক আছে। ডেনসিটিটা দাঁড়িয়েছে ২০০১ সাল নাগাদ ২৩%-এর মতো। সেই পার্সেন্টেজটা ক্যালকুলেট্ড করা হয়েছে ২০২৫ সাল নাগাদ। সেটা গিয়ে দাঁড়াবে ৬৬.৬৬ পার্সেন্ট। তখন গ্রামের চেয়ে শহরের আবাসন সমস্যাটা দিন দিন প্রকট হতে থাকবে। তাছাড়া প্রত্যেক বছর যে পরিমাণ মানুষ বাড়ছে শহরে সেটা ৪%-এর মতো। আর টোটাল আরবান সেন্টার আছে ৫২২টা। এখন যেটা বলা হচ্ছে যে ৫.২ মিলিয়ন ইউনিট আর নিডেড ইন আরবান এরিয়াস। এর মধ্যে ফরমাল সেক্টর অর্থাৎ সরকার এবং ডেভেলপার দুটো পক্ষ আছে। এর মধ্যে থেকে ৫% এই যে ৫.২ মিলিয়ন আমাদের রিকয়ালর্ড তার থেকে ৫% আমরা ফরমাল সেক্টর থেকে প্রোভাইড করতে পারছি। তার মধ্যে ওয়ান পারসেন্টের কম। প্রোভাইড করছে সরকার। আরো যে চার

Born to Build
SHAH CEMENT

পার্সেন্ট-এর বেশি সেটা হচ্ছে ডেভেলপারদের থ্রুতে। এটা যে কম সমীক্ষা তা নয়। আমরা যদি ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের হিসাব করি যে আর্কিটেক্ট দিয়ে ডিজাইন করা বা ডিজাইন বিল্ডিংয়ে সংখ্যা খুব কম। ৫ থেকে ৭ শতাংশ ধরা হয়। আমরা যদি লক্ষ্য করি ২০২৫ সালে আমাদের কি অবস্থা হবে। তখনও যদি আমরা ৫% এভেল করি, তারপরেও আমাদের ডেভেলপারদের ওপর থ্রেট অনেক বেশি পড়ে যাবে। সেই সঙ্গে কিন্তু দেখা যাচ্ছে সরকার এবং ডেভেলপারদের মধ্যে দ্বন্দ্ব চলে আসছে। সরকার কখনো ডেভেলপারদের একপক্ষ ভাবতে পারছে না। মাঝখান থেকে ভিকটিমাইজ হচ্ছে সাধারণ মানুষ। তাদের ওপর ল্যান্ড প্রাইজ, লাইন প্রাইজ বেড়ে যাচ্ছে। ইনকাম তো বাড়ছে না। আরবান এরিয়া রিপোর্ট ১৯৯৭ এবং প্রিলিমিনারি রিপোর্ট ২০০১ সালের সেনসার থেকে যেটা করা হয়েছে সেই রিপোর্টে বলা হয়েছে ১৯৫১ সালে ঢাকার জনসংখ্যা ছিল ৩ লাখ ৩৬ হাজারের মতো। এরিয়া ছিল ৭২ কিলোমিটার। তখন প্রতি কিলোমিটারে লোক বাস করতো ৪৬৬৬। সেটা ২০০১-এ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ঢাকার এরিয়া ৩৬০ স্কয়ার কিলোমিটার। আর ডেনসিটি বেড়েছে ১৪৯৯৩ জন। ৪ হাজার থেকে ১৪ হাজার। ১০ হাজার ডেনসিটি প্রতি স্কয়ার কিলোমিটারে। এর মধ্যে কাউকে আমরা ঢাকা থেকে বিতাড়িত করতে পারবো না। যেগুলো ডেভেলপ করছে পাম এরিয়া থেকে সরকার বিভিন্ন সময় তাড়িয়ে দিচ্ছে। ওদের আমাদেরই দরকার। ওই লোকগুলোই কাজ করছে আমাদের সাইডে। আমাদের বাসায় ওদেরকে আমরা কিন্তু ফেলে দিতে পারি না। আমাদের লোকালিটিরই একটা পার্ট হিসেবে ওদের গণ্য করতে হবে। ওদের নিয়ে সরকারি বেসরকারি কোনো ক্ষেত্রেই চিন্তা করা হচ্ছে না। ভারতে সরকারি এবং বেসরকারি সেক্টরকে কেন্দ্র করে কিছু পরিকল্পনা হচ্ছে, আমরা এই লেভেল চিন্তা করতে পারছি না কেন?

১৯৫১ সালের যেখানে ১০০ জন ছিল ঢাকার লোকসংখ্যা সেখানে ১৫৬১ জন হয়ে গেছে। সেই সঙ্গে শহরের পরিধি বেড়েছে ৪০০% আর পপুলেশন ডেনসিটি বেড়েছে ২২০%। যদি ১০০ বেইজ লাইন ধরে নেই। আমাদের ডেভেলপমেন্টটা মিডল্ ইনকামের মধ্যেও নেই। হায়ার মিডল্ ইনকামদেরই অনেক কষ্ট করতে হয়। আমাদের দেশে কেন লোয়ার মিডল্ ইনকামদের আমরা কেন রিচ করতে পারি না সে সম্পর্কে অনেক অভিযোগ আমরা শুনলাম। সরকার সহযোগিতাপূর্ণ নয়। আমরা কেন্দ্রস্থলকে বাড়াতে পারছি না। সবাই ধানমন্ডিতে ফ্ল্যাট কিনতে চাচ্ছে। ওর কারণ আমাদের কোনো মাস্টারপ্ল্যান নেই। আমি চাইলেই সাভার থেকে এসে মতিঝিল অফিস করতে পারবো না। কারণ ওই পর্যন্ত যানবাহন ব্যবস্থার সাপোর্ট আমাদের নেই। এই সুবিধাগুলো থাকলে হয়তো দেখা যেত যে এক্সক্লুসিভ এলাকাগুলো আমরা আউট সাইড থেকে আউট সাইডে নিয়ে যেতে পারতাম। তার পরে যেটা সেকেন্ডারি সুবিধা পেতাম যে আরবান ভ্যালু যেমন ধানমন্ডির অনেক বেশি। বারিধারার অপেক্ষাকৃত কম। মিরপুরে কম সেগুলো সেগরিগেটেড হয়ে যাবে। ল্যান্ড ভ্যালু কমে গেলে সেলিং কস্ট অনেকটা কমে যাবে। ধানমন্ডিতে যেটা ২৩৫০ টাকা স্কয়ার ফিট সেল করছি, নিকেতনে গিয়ে সেটা দেখা যাচ্ছে ১৬৫০, ১৭০০ টাকায় সেল করছি। এটার কারণ একটা হতে পারে, ল্যাক অব কমিউনিকেশন, ডিমান্ড বেশি এলাকার, আরেকটা হতে পারে ল্যান্ড ভ্যালু অনেক বেশি।

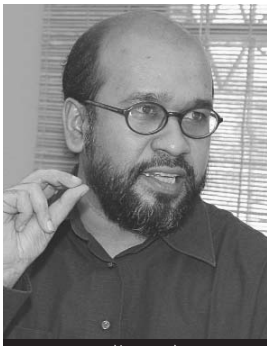
ড. শায়ের গফুর

‘আমাদের নাগরিক জীবনযাত্রা যথেষ্ট আধুনিক এবং দ্রুত হচ্ছে। আমাদের সঙ্গে স্কাই মিডিয়া, স্কাই চ্যানেলের যে সম্পৃক্ততা সেটাও একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। একজন মানুষের যে জীবনযাত্রা সেক্ষেত্রে আবাসনের ব্যাপারে তার বিভিন্ন রকম চাহিদা হয়। এই লাইফ সাইকেলের রেসপন্ডের যে হাউজিং সেটা বিদেশে বিদ্যমান’

আপনাদের মতে এই হাউজিং সেক্টরটা মধ্যবিত্ত এবং নিম্ন মধ্য বিত্তদের কাছে খুব সহজে কিভাবে রিচ করতে পারি? ৬৬.৬৬% যখন আরবান পপুলেশন হয়ে যাবে তখন ওই লোডটা আমরা কিভাবে মোকাবেলা করতে পারি? শুধু সরকারের ওপর দোষ চাপিয়ে দিলে নাগরিক হিসেবে বোধহয় আমরা অন্যায় করবো। আমাদেরও কিছু দায়িত্ব চলে আসে। সবার কাছেই এই প্রশ্নটা থাকলো।

হামিদ : বিদেশে একটা অ্যাপার্টমেন্টের দাম ৬০ হাজার বা ১ লাখ ডলার। একজন মধ্যবিত্ত বায়ার ওখানকার সেটা কিন্তু কিনতে পারে। কারণ তার ফাইন্যান্সের যে সার্কেলটা এমনভাবে তৈরি যে সে প্রতি মাসে একটা কিস্তি দিয়ে সেটা কিনতে সক্ষম হতে পারে।

সরকার ইচ্ছা করলেও কিন্তু খুব কঠিন ব্যাপার এই কনস্ট্রাকশন কস্ট কমানো। অনেকগুলো সেক্টর কাজ করে কনস্ট্রাকশনের সঙ্গে। মেথড অব কনস্ট্রাকশনে হয়তো আমরা কিছুটা পরিবর্তন আনতে পারি। চাহিদা যেটা এক্সপেকটেশন সেটাতে হয়তো পরিবর্তন আনতে পারি। বাঙালিদের চাহিদা অনেক বেশি। সরকারি বাসায় থাকবে ২০০ স্কয়ার ফিটে। আর অ্যাপার্টমেন্ট যখন কিনতে যাবে তখন চাইতে ২০০০ স্কয়ার ফিট। সার্ভেন্ট কোয়ার্টার, কিচেন, তিন বেড রুম, লিভিং দরকার, বাথরুমটা বড় দরকার। তো এই এক্সপেকটেশনটা আমরা কন্ট্রোল করতে পারি। এভাবে যদি চিন্তা করি যে একটা মানুষ ৩ বা ৪ হাজার টাকা প্রতি মাসে দিয়ে একটা অ্যাপার্টমেন্টের মালিক হতে পারে তাহলে কিন্তু বিশাল সম্ভাবনা এই সেক্টরে। কিভাবে সম্ভব হবে, বাকি টাকা কোথা থেকে আসবে? বিদেশে ফাইনান্স কোম্পানিগুলো এই ঋণ দেয়। আমাদের দেশে এ ঋণ দেয় ১০ বছরের জন্য। আর তারা দেয় ৬০ বছরের জন্য। লো ইন্টারেস্টে টাকা দেয়ার জন্য তারা বসেই আছে। ৪ থেকে ৫ পার্সেন্ট। ৩ পার্সেন্ট ইন্টারেস্টেও হয়। তারা দেখছে বাসা ভাড়া হয়তো দিত ৮ হাজার টাকা। সেই টাকার ইনস্টলমেন্টে সে একটা বাড়ির মালিক হয়ে যাচ্ছে।

সালাউদ্দিন : যদি একটি প্রোজেক্টের দাম এক কোটি টাকা হয়। ব্যাংক হয়তো ফাইনান্স করে অনলি ৪০% অব দ্য টোটাল কস্ট। বাকি ডেভেলপাররা বসে থাকে হয়তো অ্যাপার্টমেন্ট কিনবে যারা তাদের কাছ থেকে যেটা অ্যাডভান্স পাবে সেটার জন্য। এতে হয় কি দেরি হয়ে যায় কনস্ট্রাকশন টাইম। কস্ট অব দ্য কনস্ট্রাকশন বেড়ে যায়। অনেক সময় অ্যাপার্টমেন্ট বিক্রি না হলে শেষ পর্যন্ত কনস্ট্রাকশন বাদও হয়ে যায়। বিদেশে এটা হচ্ছে না। সেখানে টোটাল ফাইনান্সটা তারা পাচ্ছে। এক কোটি টাকাই তারা ফাইনান্স পাচ্ছে। এই এক কোটি টাকা ট্রান্সফার হয়ে যায় কিন্তু শেষ পর্যন্ত অ্যাপার্টমেন্টের বায়ারদের কাছে। এদিক দিয়ে বায়াররাও হোম লোন নিচ্ছে। আস্তে আস্তে ওদিকে ট্রান্সফার হয়ে যাচ্ছে। আর ফাইনানসিয়াল ইনস্টিটিউটগুলো করে কি প্রোপারশন অনুযায়ী তারা যে মর্টগেজটা দিল প্রোজেক্টের সেটা করতে থাকে। জমির ওপর এক কোটি টাকা লোন দিয়েছে, এখানে দশটা ফ্ল্যাট হবে, যে কিনছেন একটা ফ্ল্যাট তার প্রোপরশনটা রিলিজ করে দিচ্ছে। এই যে সিসটেমটা আমাদের সেক্টরে এটা পরিবর্তন করতে হবে। আমরা কী করি... সেক্টরে একটা ব্যাংকের কাছে লোন চাইলে সে

Born to Build
SHAH CEMENT

জমিটা নিয়েই বসে থাকি। দশটা ফ্ল্যাট হওয়ার পর যে তার অব দ্য প্রোজেক্ট বেড়ে গেল সেদিকে তারা তাকায় না। থার্ড পার্টির ফাইনান্স করার জন্য অসুবিধা হয়ে যায় তখন। এটাই যদি প্রোপারশন অনুযায়ী রিলিজ করতে থাকতো তাহলে হাউজ বিল্ডিং ফাইনান্স বা ন্যাশনাল হাউজিংরা আসতে পারতো, তারা ঐ অ্যাপার্টমেন্টটাকে মর্টগেজ করে ফাইনান্স দিতে পারতো। এটা একটা বিরাট ফ্যাক্টর। আমরা এখনও ঢাকা শহরে প্রায় ৬৫ থেকে ৭০ ভাগ মানুষ ভাড়া বাড়িতে থাকি। এদের অন্তত ৩০ ভাগ মানুষকে তো আমরা বাড়ি দিতে পারতাম। আমরা এদের হাতে টাকাটা পৌঁছে দিতে পারতাম। বাঙালিদের কিন্তু ইচ্ছা, যেভাবেই হোক বাড়ি একটা হতে হবে। বাসা বা জমি একটা দরকার। এটা তাদের চির জীবনের সঞ্চয় দিয়ে কিনতে হয়। বুড়ো বয়সে, শেষ সময়ে। এটা ভোগ করারও সময় থাকে না অনেক ক্ষেত্রে। এই সেক্টরটা যদি আমরা সঠিকভাবে করতে পারি তাহলে সেকেন্ডারি মার্কেট একটা তৈরি হয়ে যাবে বিরাট। যেটা আমরা তৈরি করতে পারিনি। এটার জন্য আরেকটা বড় বাধা রেজিস্ট্রেশন কস্ট। আমরা দশ-বিশ লাখ টাকা দিয়ে একটা অ্যাপার্টমেন্ট কিনলেও তার ২০ লাখ টাকার ওপর ২১% রেজিস্ট্রেশন কস্ট দিতে হয়। এখন হয় ১৪-১৫ পার্সেন্ট। সারা পৃথিবীতে সবচেয়ে হায়েস্ট রেজিস্ট্রেশন কল বাংলাদেশে। সর্বোচ্চ গরিব দেশে।

তানভীর : এই কারণে আন্ডার ভ্যালুজে...

ড. তৌফিক : আগে এটা হতো। আন্ডার ভ্যালুজটা রেজিস্ট্রেশন হতো। কিন্তু এখন ঢাকা শহরের জমির সরকারের একটা ট্যারিফ ভ্যালু আছে। ধানমন্ডির জমি আপনি কতো দামে কিনেছেন আর আমি কতো দামে বিক্রি করেছি এটা কোনো বিষয় নয়। সরকার যদি এ পদ্ধতির পরিবর্তন করতে চায় তাহলে ল্যান্ড ভ্যাল্যু ট্যারিফ চেঞ্জ করতে হবে। অথবা একটা আইন করতে হবে যে প্রতি দু'বছর পর জমির ভ্যাল্যু অবশ্যই রিভিউ করতে হবে। সে ক্ষেত্রে করাপশন বাদ দিয়ে যদি রেজিস্ট্রেশন করতে হয় তাহলে এটা অবশ্যই ১%-এর বেশি হতে পারবে না। চল্লিশ লাখ টাকার একটি ফ্ল্যাট ১% চল্লিশ হাজার টাকায় রেজিস্ট্রেশন হয়ে গেলে কেউ এক টাকাও ফাঁকি দেয়ার চেষ্টা করবে না। ঢাকা শহরে যদি দশ হাজার ফ্ল্যাট বিক্রি হয়, তাহলে দশ হাজার ইন টু চল্লিশ বা পঞ্চাশ হাজার টাকা ট্যাক্সের ঘরে জমা পড়বে।

নিয়মগুলোকে সহজ করতে হবে।

ড. গফুর : প্রশ্ন ছিল যে নিম্নবিত্তের আবাসন কিভাবে সমাধান করা যায়। ঢাকার মধ্যে নিম্নবিত্তের আবাসন আসলে সম্ভব নয়। এই শিরোনামের সমস্যা ও সমাধানের কথা যে বলা হলো এর সঙ্গে আমি একটা কথা যোগ করতে চাই। শঙ্কা। এ ব্যাপারেটায় আমি বলবো। নিম্নবিত্তের আবাসন পার্মানেন্ট বেসিকে সম্ভব কিনা, সেটা কিন্তু আসলে একটা বড় প্রশ্ন থাকবে। একটা সময় নিম্নবিত্তের অনেক লোকের ঢাকায় থাকার প্রয়োজন হবে না। ঢাকা শহরে যদি তাদের থাকতেই হয়, তারা বাড়ি কিনতে পারবে কিনা সেই প্রশ্নটাও তখন চলে আসবে। নিম্নবিত্তের বাসা ঢাকা শহরে কেন থাকবে সেই প্রশ্নটাও কিন্তু আগে খুঁজতে হবে। দেশের যে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক পরিকাঠামো চলছে এতে নিম্নবিত্তের আবাসন গ্রহণের ফলে যদি সেই চলাটা ভালোমতো হয় তাহলে নিম্নবিত্তের ঢাকা শহরে থাকাটা একটা অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। নিম্নবিত্তের থাকাটা জাস্টিফাই করতে হবে সেই গ্রাউন্ডে। আমরা শখের বশে ঢাকা শহরে থাকবো, সিটি লাইফ লিড করবো, নিম্নবিত্ত বোধহয় সেটা এফোর্ট করতে পারবে না। মার্কেটের স্বাভাবিক নিয়মে। আমার শঙ্কা ঢাকা শহর আস্তে আস্তে নিম্ন বিত্তহীন হয়ে যাবে। জমির দাম যেভাবে বাড়ছে, নিম্নবিত্ত বাড়ি বিক্রি করে দেবে। যেমনটা কোলকাতায় শুরু হয়ে গেছে। কোলকাতার সুবিধা হচ্ছে ওই লোকগুলো কোলকাতার বাইরে চলে গেছে। সেকেন্ডারি সিটিগুলোতে। আসল বাঙালিরা কিন্তু এখন আর কোলকাতায় থাকে না। কোলকাতার লোক এখন সব নন বেঙ্গলি।

তানভীর : আরেকটা প্রশ্ন হচ্ছে, এই ডেভেলপমেন্টটা খুব ঢাকাকেন্দ্রিক হয়ে যাচ্ছে। বিল্ডিং করে হ্যান্ড ওভার করে দেই, তারপর হাউসারদের রেসপন্সটা কেমন? তারা কি এনভায়ারমেন্ট নিয়ে হ্যাপি? তাদের যে শিশুরা আছে তারা কি খেলার জায়গা পাচ্ছে? তাদের মানসিক বিকাশটা সঠিক হচ্ছে?

ড. তৌফিক : হামিদ সাহেব একটু আগে যেটা বলেছেন যে আমাদের বাঙালিদের চাহিদার কোনো শেষ নেই। ইউরোপ আমেরিকায় যারা ডিটাচড্ বাড়িতে বাস করে তারা কিন্তু সাধারণত গ্যারেজের ভেতর দিয়েই প্রবেশ করে বাসায়। গ্যারেজ ওপেনার দিয়ে গ্যারেজটা খুলে গাড়ি গ্যারেজের ভেতর চলে যায়। আর মানুষ রান্নাঘরের ভেতর দিয়ে লিভিং রুমে যায়। এটা হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড আমেরিকান বা ইউরোপিয়ানদের ডিটাচড্ হাউসের ডিজাইন। গ্যারেজের ভেতর দিয়ে যাওয়াটা আমি দোষের কিছু দেখি না। তবে হ্যাঁ, গ্যারেজের হাইটটা একটু বেশি হলে ভালো হয়। হাউজিং-এর সমস্যা থেকে সম্ভাবনার দিকেই যাই। আমাদের সম্ভাবনা ব্যাপক। প্রাইভেট সেক্টর বাংলাদেশের হাউজিং সমস্যার সমাধান করে দিতে পারে। যদি পলিসি ঠিক ঠিক করা যায়, তাহলে পাঁচ বছরের মধ্যে মেজর পরিবর্তন এ দেশে হাউজিং সেক্টরে আনা সম্ভব। দশ বছরের মধ্যে হাউজিং সেক্টরে একটা ব্যাপক পরিবর্তন আনা সম্ভব। তাহলে কেন হচ্ছে না? হচ্ছে না এ কারণে, ১৯৭১ সালে যখন বাংলাদেশ স্বাধীন হয়, তারপর ১৯৭২ সালে আমাদের তৎকালীন রাজনীতি, ব্যুরোক্র্যাট, পেশাজীবীদের বোঝা উচিত ছিল শহরটা কোথায় যাচ্ছে। আমরা ২,৩,৫ বছরের মধ্যে ওই শহরের বৃদ্ধির ট্রেন্ডটা ভিজ্যুয়ালাইজ করতে পারিনি। এটাই প্রাথমিক দায়িত্ব ব্যুরোক্র্যাট এবং রাজনৈতিক নেতৃত্বের। একটা সদ্য স্বাধীন দেশে এটা আশা করাও যায় না। কারণ তখন এ দেশে কী হতে যাচ্ছে, ১৯৭২ সালে সেটা ভিজ্যুয়ালাইজ করা আসলেই সম্ভব ছিল না। কাজেই এই দায়িত্বটা ছিল প্রফেশনালদের। আমি নিজে যেহেতু একজন প্রফেশনাল। তাই আমি মনে করি ১৯৭২-৭৩ সালের প্রফেশনালরা বাংলাদেশ কোন দিকে যাবে, ঢাকা শহরের বৃদ্ধি কোন দিকে হবে, ২০ বা ২৫ বছর পর ঢাকা শহরের জনসংখ্যা কত দাঁড়াতে পারে, ঢাকা শহরকে কিভাবে গড়ে তোলা উচিত, তারা সেটা ভাবেনি। পাঁচ বছর ভুল করেছে। দশ বছর পরে যে সেট অব প্রফেশনাল এবং রাজনীতিবিদ ছিল, তাদেরও ভিশনে ছিল না। দশ বছরের মধ্যে তো ট্রেড সেট হয়ে গেছে। ১৯৮১ সালের পরের প্রফেশনালরা চিন্তা করলো দেশ কোন দিকে যাচ্ছে। ১৯৮১-৮২ সালে একটা মাস্টার প্ল্যান হয়েছিল? যেটাকে ইনট্রিগ্রেটেড আরবান প্ল্যান বলে, সেটার মধ্যে প্রচুর দিকনির্দেশনা ছিল। অনেক টাকা

স্থপতি তানভীর আহমেদ

'আমরা যদি লক্ষ্য করি ২০২৫ সালে আমাদের কি অবস্থা হবে। তখনও যদি আমরা ৫% এভেল করি, তারপরেও আমাদের ডেভেলপারদের ওপর থ্রেট অনেক বেশি পড়ে যাবে। সেই সঙ্গে কিন্তু দেখা যাচ্ছে সরকার এবং ডেভেলপারদের মধ্যে দ্বন্দ্ব চলে আসছে। সরকার কখনো ডেভেলপারদের একপক্ষ ভাবতে পারছে না'

Born to Build
SHAH CEMENT

খরচ করে ওটা করা হয়েছিল। এই দিকনির্দেশনা মানার কোনো মেকানিজম বাংলাদেশে করা হয়নি। শুধু ঢাকাকে ডেভেলপ করলে তো হবে না। দরকার ছিল বাংলাদেশের নগরায়ণ কিভাবে হবে। আজকে আমরা যেটা বলছি, ঢাকা শহরে এক কোটি লোক থাকবে কি না, থাকা উচিত কি না, থাকতে পারবে কি না। ঢাকা শহরে তো এক কোটি লোক থাকার দরকার নেই। কিন্তু ঢাকা শহরে এক কোটি লোকে না আসারও কোনো উপায় নেই। ঢাকা চট্টগ্রামের পর আর কোনো শহরে নগর সুযোগ-সুবিধা নেই। আমি মনে করি, সারা বাংলাদেশের নগরায়ণ যদি এক তালে না হয়, সরকার যদি ঢাকার বাইরে আরবান ইনফ্রাস্ট্রাকচার সুচিন্তিতভাবে গ্রো না করে, তাহলে ঢাকা বাড়তেই থাকবে অপরিকল্পিতভাবে। বানে ভাসা, গৃহহীন সবাই ঢাকায় আসবে। চিকিৎসা, পড়ালেখার জন্য, বেকার লোকেরা মেসে থেকে চাকরি খোঁজার জন্য ঢাকায় আসবে। কাজেই ঢাকার বৃদ্ধির কোনো বিকল্প নেই, যতক্ষণ পর্যন্ত ঢাকার বাইরে বড় শহর গড়ে না উঠছে। বাংলাদেশের আরবান সেন্টারগুলো যদি গ্রাফিক্যালি প্লট করা হয়, দেখা যাবে আরবান প্রাইভেসি ইনডেক্স ইস্টু অলমোস্ট দ্য হায়েস্ট ইন দ্য ওয়ার্ল্ড। ন্যাশনাল আরবান ইজেশনকেই প্রাধান্য দিতে হবে সরকারকে। রাদার দেন লিভিং প্রায়োরিটি টু দ্য হাউজিং অব ঢাকা সিটি। তার পরেও তো ঢাকার লোকসংখ্যা এক কোটির নিচে নামবে না। নিউজ উইক ডিসেম্বর ২০০৩ ওয়ার্ল্ড ব্যাংক এবং নিউজ উইকের পরিসংখ্যানে আছে ২০১৫ থেকে ২০২০-এর মধ্যে ঢাকার জনসংখ্যা হবে ২০ মিলিয়নের বেশি। ইট উইল বি নেক্সট টু টোকিও।

টোকিওর বর্তমান পপুলেশন আছে ১৯ মিলিয়ন। আগামী ১৫ বছরে ওটা বাড়বে ১ মিলিয়ন। ঢাকার বর্তমান পপুলেশন ১০ মিলিয়ন বা ১১ মিলিয়ন। আমরা বেড়ে হবো ১৯ মিলিয়ন। সুতরাং আগামী ১০-১৫ বছরে টোকিওর মতো দেশ যেখানে ১ মিলিয়ন অ্যাবজর্ভ করতে হিমশিম খাচ্ছে, আমরা স্বচ্ছন্দে ৯-১০ মিলিয়ন অ্যাবজর্ভ করবো বলে হাত-পা ছেড়ে দিয়ে বসে আছি। ২ কোটি লোক ঢাকায় থাকলে আমরা গাড়ি বের করবো কি করে জানি না।

মোর্তোজা : ঢাকার আশপাশে যে জলাশয়গুলো আছে। সেগুলো নানাবিধভাবে ভরাট করা হচ্ছে।

তৌফিক : প্রথমেই বলা হয়েছে ঢাকা শহরের কোনো মাস্টার প্ল্যান নেই। আমাকে জানতে হবে যে এই জায়গায় বাড়ি বানানো যাবে, এখানে যাবে না। আমরা তা অনুসরণ করবো। আমি কেন একটি পুকুর ভরতে যাবো। কারণ পুকুর তো কেউ কিনবে না। যদি জানা যায় যে পুকুর ভরা যাবে না, তাহলে সেখানেই বন্ধ হয়ে যাবে। প্রাথমিকভাবে দরকার হচ্ছে পরিকল্পনা। সেটা আমাদের নেই। কাউকে শুধু শুধু দোষ দিয়ে লাভ নেই।

মোর্তোজা : অনেকগুলো প্রশ্ন নিয়ে আমরা আলোচনা করলাম। এবার আমরা সাধারণ কিছু বিষয় নিয়ে কথা বলবো। প্রবাসী ক্রেতাদের বিষয়ে আপনাদের আলাদা কোনো চিন্তা-ভাবনা আছে কি না। এ বিষয়ে সুবাস্তু ডেভেলপমেন্টের ম্যানেজার সেলস এন্ড মার্কেটিং লুৎফুল্লাহ হুসাইন, আপনি সম্ভবত কিছু বলতে চাইছিলেন।

লুৎফুল্লাহ হুসাইন : প্রবাসীদের ক্ষেত্রে আমরা যেটা করি, তাদের কাছ থেকে বুকিং মানিটা নিলাম। লোনের জন্য পাঠানোর পর দেখা গেল লোনটা হবে না, ফ্ল্যাটটা ক্যানসেল হয়ে গেল। আমরা একটা নিয়ম এরকম ধরেই নিয়েছি যে, প্রবাসীদের কাছ থেকে লোনের মাধ্যমে কোনো ফ্ল্যাট বিক্রি করা যাবে না। আমরা যখন কোনো ইনস্টিটিউশনের কাছে কোনো লোক পাঠাই তখন এমন কোনো কাগজ পাঠাই না যে লোনের ব্যাপারে ইন্টারেস্টেড। দিস ইজ দি রিজন বিহাইন্ড। ১৫ জনের মধ্যে কেন ২ জন পান? হয়তো যেকোনো মুহূর্তে মনে হয়েছে যে, দেখি তো কথা বলে লোনের জন্য হয় কি না। সব প্রবাসী লোন চান। আমরা সুবাস্তু ডেভেলপমেন্ট যেটা করছি, ইন্টারন্যাশানাল মার্কেটিং করার চেষ্টা করছি। মালয়েশিয়া, মিডলইস্ট, ইটালিতে কাজ করছি। মালয়েশিয়া বা মিড্‌লইস্টে কিন্তু মানুষ যায় ফিরে আসার জন্য। কিছু দেশে যায় থেকে যাওয়ার জন্য। তারা ওখান থেকে যে টাকাটা পাঠান দেশে তারা বিশ্বাস করতে পারেন না, টাকাটা সঠিকভাবে ইনভেস্ট করা হবে কিনা। সেই দ্বিধাটা থাকে। সরাসরি আমাদের কাছে তারা টাকা পাঠাতে চায়। দেখা যাচ্ছে ৩-৪ বছরের মধ্যে আমরা একটা প্রোজেক্ট কমপ্লিট করে হ্যান্ডওভার করে দেই। মলয়েশিয়া, মিডলইস্ট এবং ইটালি-এই দেশগুলোতে দোকানের জন্য খুব ডিমান্ড লক্ষ্য করি। তারা দোকান কিনতে চায়। কিন্তু আমাদের ইনস্টিটিউটগুলো কমার্শিয়াল ইনভেস্টমেন্টে যায় না। আমরা জানি, এই টাকাটা পেলে আমাদের দেশের জন্য অনেক ভালো।

এখন আমরা বৈদেশিক অর্থের ওপর ব্যাপকভাবে নির্ভর করি। কিন্তু এই টাকাটা আমরা হাতে পাই না। শুধু আবাসন শিল্প নয়, পুরো দেশের জন্যই একটা বড় ভূমিকা পালন করতে পারে। যেটা পারছে না। যখনই আয়ের সার্টিফিকেট দেখাতে বলা হচ্ছে, তখন সেই সার্টিফিকেটা তো আনতে হবে সেই দেশ থেকে। এই প্রক্রিয়াগুলো খুবই জটিল।

মোর্তোজা : অনেকেই প্রবাসে ভিসাহীনভাবে আছেন। তিনি কিভাবে আয়ের সার্টিফিকেট দেখাবেন? আয় হয়তো মাসে ২ লাখ টাকা, কিন্তু কোনো বৈধতা নেই। তার পক্ষে আয়ের সার্টিফিকেট দেখানো তো সম্ভব নয়। অনেক প্রবাসীদের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ হয়, কথা হয়। তারা প্রায়ই যে অভিযোগটা করেন, ওমুক প্রতিষ্ঠানের কাছে একটি অ্যাপার্টমেন্ট কেনার জন্য টাকা দিয়ে যাচ্ছি, এখন শুনলাম যে ওই প্রতিষ্ঠান নাকি বাংলাদেশে ভালো অবস্থায় নেই বা বিল্ডিং নাকি হচ্ছে না- একটু খোঁজ-খবর নিয়ে দেন না! এই যে প্রবাসীদের একটা আতঙ্কজনক অবস্থা, আত্মীয়দের বিশ্বাস করতে পারে না, ডেভেলপাররা বিশ্বাস অর্জন করতে পারছে না- এই অসহায় অবস্থা থেকে প্রবাসীদের আপনারা কিভাবে মুক্ত করতে পারেন? কিভাবে তাদের পাশে দাঁড়াতে পারেন। যেন তাদের কষ্টার্জিত অর্থের সঠিক ব্যবহার হয় এবং একটি নির্দিষ্ট সময় পর তিনি যেন একটা অ্যাপার্টমেন্টের মালিক হতে পারেন।

তৌফিক : আনসার সাহেবকে বলতে চাই যে, লোনের প্রক্রিয়াটা আরো সহজ করা যায় কি না তা নিয়ে আপনারা যদি একটু ভাবেন।

আনসারউদ্দিন : কিছু জায়গা আছে যেখান থেকে প্রবাসীরা একটা নির্দিষ্ট সময় পর দেশে ফিরে আসে। কিন্তু এই সৌদি আরবে যারা আছেন তাদের আয় অত্যন্ত সীমিত। আমেরিকা, কানাডা বা অস্ট্রেলিয়ায় যারা আছেন তাদের আয় ভালো। ফাইন্যানশিয়াল বডি হিসেবে আমাকে দুটো জিনিস ভাবতে হয়। সাপ্লাই এবং ডিমান্ড। ডিমান্ডের প্রেক্ষিতে আমি সাপ্লাই দিচ্ছি। কিন্তু রিটার্নটা তো আমাকে ভাবতে হবে। ক্লায়েন্টের অবশ্যই কনস্টেন্ট ইনকাম থাকতে হবে। পার্মানেন্ট চাকরি থাকতে হবে। কারণ আমি যে ২০-২৫ বছরের জন্য টাকা দিচ্ছি, সেটা তো ফিরে আসার নিশ্চয়তা থাকতে হবে। বাংলাদেশের স্থায়ী বাসিন্দাকে হাউজিং সেক্টরে এখনই আমাদের তিনটা প্রতিষ্ঠানে ৫ থেকে ৭ পার্সেন্ট ক্লাসিফায়েড হোম। সেভিংস এন্ড ফোন এসোসিয়েট ইউএসএ এবং বিল্ডিং সোসাইটিজ অব ইউকে, জার্মানি এন্ড ফ্রান্স তাদের হোম মর্টগেজের ক্লাসিফিকেশন হচ্ছে ১ থেকে ২ পার্সেন্ট।

হামিদ : আপনি উন্নত দেশের সঙ্গে তুলনা করছেন কেন?

আনসারউদ্দিন : এমন কি শ্রীলঙ্কা। শ্রীলঙ্কা একটি উন্নয়নশীল দেশ। সেখানেও রেট খুব কম। কিন্তু এখন শঙ্কার কারণ একটা আছে ইফ ইউ গো ফান্ড দেয়ার ইজ পসিবিলিটিস অব ফলিং ইউর ফান্ড। দেয়ার আর সার্ভেনেসেসিটি হুইচ আর ইভেন ইন নেভার কাট আওয়ার নেসেসিটি । কিছু

Born to Build
SHAH CEMENT

কাগজ পত্র আমাদের লাগবেই। মে বি ইউ ক্যান মেইক ইট ফাস্টার। আমরা চেষ্টা করি, একটা লোককে ভ্যালুয়েড করার জন্য তার কনস্ট্র্যাকটিভ কাজ, ক্যাপাসিটি টু পে এন্ড দ্য পারসন হু ইজ কনস্ট্রাক্ট লোকালি।

মোর্তোজা : আপনার অবস্থানে আপনি সঠিক। কিন্তু যে প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে একজন প্রবাসীকে আসতে হবে জমি বা ফ্ল্যাটের মালিক হওয়ার জন্য যে যোগ্যতাগুলো তাকে অর্জন করতে হবে সেটা একজন প্রবাসীর জন্য কষ্টকর এবং কঠিন কাজ।

তৌফিক : আমার মনে হয়, আমাদের দেশের ফোর্ট ব্লোজারগুলো আরো একটু স্ট্রিক্ট যদি করা যায় এটা ফাইনানশিয়াল ইনস্টিটিউটের ফেভারে যাবে। সে ক্ষেত্রে ক্লাসিফায়েড লোন কম হবে। সেটা দেশে বা প্রবাসে যেখানেই হোক। যে ডিফল্ডার হবে, ফাইন্যানশিয়াল ইনস্টিটিউটের ক্ষমতা থাকবে তার প্রপার্টি ক্লোজ করে দেয়ার। এতে করে আপনাদের ক্ষতি কমে যাবে। আইন মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে একটু বসে যদি আপনারা ফোর্ট ক্লোজার স্ট্রিক্ট করা যায় তাহলে ভালো হয়।

আনসারউদ্দিন : আমাদের গৃহায়ন নীতিমালা যেটা হলো ঐখানেও ফোর্ট ক্লোজার ল'টাকে আরো তাড়াতাড়ি ডেলিভারি করার জন্য প্রস্তাব আছে। কিন্তু আমাদের দেশে সবসময় গরুটা গোয়ালে থাকে না। খাতায় পাওয়া যায়।

তৌফিক : রিহ্যাব হচ্ছে একটা রিয়েল এস্টেট অ্যাসোসিয়েশনগুলোর একটা এপেক্স বডি। আমরা একটা ট্রেড বডি। মিনিস্ট্রি অব কমার্সের রুলস রেগুলেশনস দ্বারা আমরা দায়বদ্ধ। আমাদের কোনো স্ট্যাটুইটরি রাইট নাই টু গিভ এনি গ্যারান্টি টু এনিবডি। আমাদের নিয়ন্ত্রণ করারও কোনো অধিকার নাই, সহায়ক শক্তি হতে পারি। আমার কোম্পানির বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ থাকলে আর তা রিহ্যাবকে কমপ্লেইন করলে এবং রিহ্যাব থেকে যদি আমাকে একটা চিঠি দেয়া হয় যে আমার কোম্পানি এই করেছে সেটা খতিয়ে দেখার জন্য। এটা কিন্তু আমার ওপর একটা চাপ। আমি রিহ্যাবের সদস্য থাকাকালে এবং যদি ব্যবসা চালিয়ে যেতে চাই তাহলে আমার কোম্পানির সুনামের সঙ্গে আমি চেষ্টা করবো যতটা মিনিমাইস করা যায়। এর বেশি কিছু করার ক্ষমতা ঠিক এই মুহূর্তে রিহ্যাব-এর নাই। তবে আমরা গত বছরগুলোতে যথেষ্ট ফর্মালিটিজ হওয়ার চেষ্টা করেছি। রিহ্যাব-এর পরিচিতি পেয়েছে। রিহ্যাব-এর সদস্য ডেভেলপারদের সুনাম ক্রেতাদের কাছে অনেক বেশি। গত দুই এক বছরের অনেক অভিযোগে আমরা এভাবে সমাধান করেছি। ক্লায়েন্টদের কাছে আমরা বলতে পারি যে একটু হোম ওয়ার্ক করে ফ্ল্যাট কেনা উচিত।

গাড়ি কেনার সময় যেমন ১০টা শো রুম ঘুরে গাড়িটা কেনা হয়, ঠিক তেমনিভাবে হোম ওয়ার্ক করে কেনা উচিত। রিহ্যাবের গ্রহণযোগ্যতা অনেক বেশি। এখনও তেমন মেজর অভিযোগ আমাদের সদস্য সম্পর্কে কমে গেছে।

মোর্তোজা : আমরা জানি দেশের বাইরে নিউ ইয়র্কে আপনারা ১৯ আগস্ট একটা মেলার আয়োজন করছেন। এই মেলা আয়োজনের লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য কী?

তৌফিক এম. সেরাজ : দেশের বাইরে আমাদের এটাই প্রথম মেলা। প্রথমেই আমরা নিউইয়র্ক বেছে নিলাম এজন্য যে গত বছরগুলোতে দেখা গেছে ১১ সেপ্টেম্বরের পরে অনেকে দেশে ফিরছে। আবার অনেকে আছেন যারা কোনোদিনই ফিরবে না ভেবেছিলেন কিন্তু এখন প্রয়োজনে যেন ফিরতে পারেন ওই মানসিকতা জন্মেছে।

লুৎফুল্লাহ হুসাইন

'সুবাস্তু ডেভেলপমেন্ট যেটা করছি, ইন্টারন্যাশানাল মার্কেটিং করার চেষ্টা করছি। মালয়েশিয়া, মিডলইস্ট, ইটালিতে কাজ করছি। মালয়েশিয়া বা মিড্‌লইস্টে কিন্তু মানুষ যায় ফিরে আসার জন্য। কিছু দেশে যায় থেকে যাওয়ার জন্য। তারা ওখান থেকে যে টাকাটা পাঠান দেশে তারা বিশ্বাস করতে পারেন না, টাকাটা সঠিকভাবে ইনভেস্ট করা হবে কিনা। সেই দ্বিধাটা থাকে'

নিউইয়র্ক থেকে অনেকেই আমাদের ফোন করে বলেন যে তারা ফ্ল্যাট কিনতে চান কিন্তু দূরত্বটার কথা বলেন। আর ১২ ঘন্টা সময় ডিসটেন্ট হওয়ায় টেলিফোনে যোগাযোগ ও অসুবিধার। কারণ আমরা যখন অফিস করি তখন তারা ঘুমান। বিদেশে বেশি দিন থাকলে মনে হয় দেশে লোকজন কেমন করে থাকে। আমি গতকালই নিউইয়র্ক থেকে এলাম। ওখানে সবার ধারণা, পুরো বাংলাদেশই বন্যায় ডুবে গেছে। বন্যা ৫০ বছর আগেও আমাদের দেশে হয়েছে। ২৫ বছর আগেও হয়েছে। ১৯৮৮ সালে তো যথেষ্ট বেশি হয়েছে। ড. আইনুন নিশাত বলেছেন বন্যা আমাদের পার্ট অব লাইফ। বন্যা তো ঠেকানো যাবে না। সেটাই সত্য। বিদেশে থাকলে যেটা হয়, মনে হয় প্রতিদিনই সন্ত্রাস হচ্ছে, ঘর থেকে বের হলেই সবাই মেরে ফেলছে এসব।

হয়তো কোনো এক ডেভেলপারের কাছ থেকে কেউ সময় মতো টাকা ফেরত পায়নি। পুরো নিউইয়র্ক এই খবর ছড়িয়ে গেল যে বাংলাদেশে ডেভেলপারদের টাকা দিলেই আর ফেরত পাওয়া যায় না। সবার ধারণা কোনো নিয়ম নীতি ডেভেলপাররা মানেন না। আমরা সেখানে এই ভীতিটা ভেঙে আমাদের ইমেজ তৈরি করতে চাই। একবারও ভাবছি না সেখানে মেলা করা মাত্রই ১০টা ফ্ল্যাট বিক্রি হয়ে যাবে। আমার ২টা ফ্ল্যাট বিক্রি হয়ে গেল। কিন্তু এটার মাধ্যমে বাংলাদেশের ইমেজ, বাংলাদেশী ব্যবসায়ীদের ইমেজ, বাংলাদেশের ডেভেলপারদের ইমেজ আমরা প্রতিষ্ঠা করতে চাই। আমরা ৩০ জন ডেভেলপার যাচ্ছি। যারা প্রত্যেকে প্রফেশনাল, প্রত্যেকে শিক্ষিত। এদের অনেকেই ১৫ থেকে ২০ বছর ধরে ব্যবসা করছে। সুতরাং তিনি নিজে থেকে যখন ৫০টা লোকের সঙ্গে কথা বলবেন আমি মনে করি পরবর্তীতে ঐ পঞ্চাশটা লোক আমাদের বলবেন পজেটিভ কথা। তাতে পরবর্তীতে প্রোজেক্ট বিক্রিতে এটা অত্যন্ত সহায়ক হবে। এবারও আমরা আশা করছি কিছু অর্ডার বা ডিরেক্ট কন্টাক্ট স্টাবলিস্ট করতে পারবো। এটাই মূল উদ্দেশ্য।

মোর্তোজা : এরপর কি অন্য জায়গায় আবার এমন ধরনের মেলা করার পরিকল্পনা আছে?

তৌফিক : ঠিক এখনই না। এটার গ্রহণযোগ্যতা, সার্থকতার ওপর ভিত্তি করে ভবিষ্যতে দুবাই, মালয়েশিয়াতে চেষ্টা করবো।

মোর্তোজা : এই অল্প সময়ে সবগুলো বিষয় নিয়ে আলোচনা সম্ভব নয়। তারপরও অনেকগুলো বিষয় আলোচনা হয়েছে। ঢাকার জন্যে একটি মাস্টার প্ল্যান জরুরি, ঋণের সুদের হার কমানো, প্রক্রিয়া সহজ ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা হলো। আশা করি নীতিনির্ধারকরা বিষয়গুলো গুরুত্ব দিয়ে ভাববেন। উদ্যোগ নেবেন সমস্যা সমাধানের। এতে সংকট কেটে যাবে। বিকশিত হবে আবাসন শিল্প। সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের আলোচনা এখানেই শেষ করছি।

Av‡qvRK : bvRgj Avnmvb
ReŸvi †nv‡mb, mwgDj Bmjvg
k"wZ wjLb : wkíx gnjvbexk
Qwe : Zwnb †nv‡mb, Av‡bvqvi gRg`vi